ইসলাম ও বিজ্ঞান

প্রফেসর ড. নাজিমুদ্দীন এরবাকান

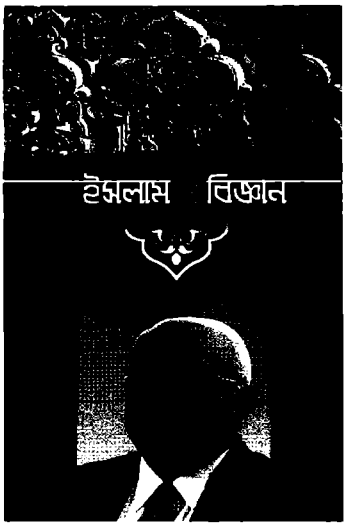

ইসলাম ও বিজ্ঞান

সৃজনশীল বই প্রকাশক ও বিক্রেতা
প্রত্যয় প্রকাশনী

www.pathagar.org

ইসলাম ও বিজ্ঞান

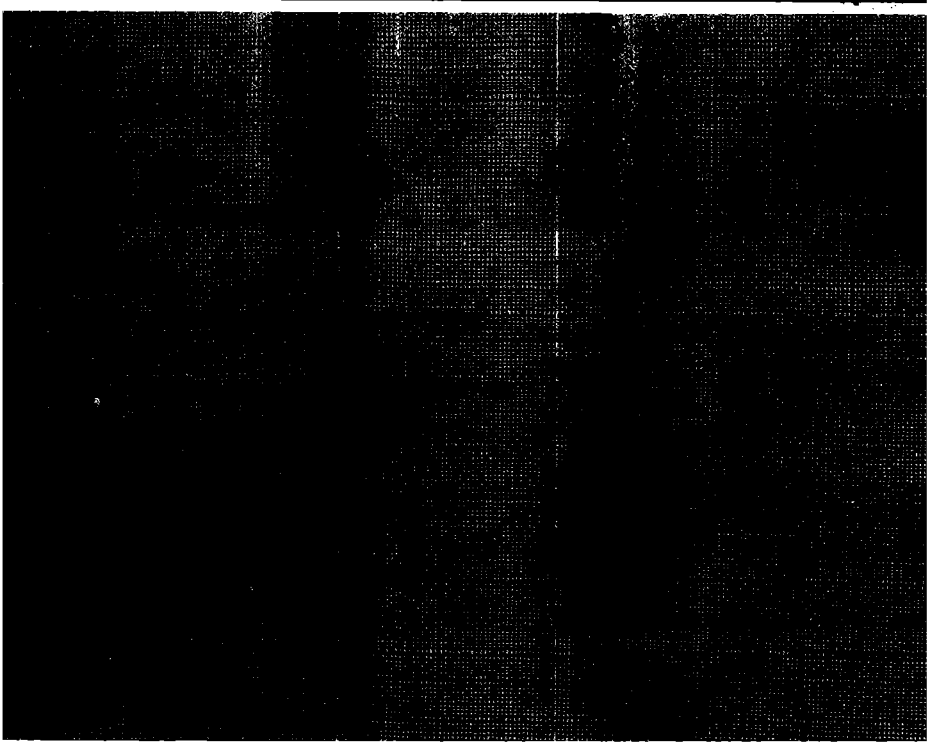

ISLAM O BIGGAN (Islam & Science) by Dr. Nazimuddin Erbakan
Published by : Prottoy Prakashony, 491 D/2 Elephant Road
Wireless Railgate, Boro Moghbazar, Dhaka-1217, Bangladesh
Mobile : 01684511668, 01966051854
E-mail : prottoyprakashony@gmail.com
1st Edition : Aug. 2014.
Price : Taka 25 only

www.pathagar.org

আমরা এখন বাস করছি আধুনিক বিজ্ঞানের যুগে। যে সময়টাতে নিত্য-নতুন আর আশ্চর্য আবিষ্কারকে আমরা স্বাভাবিক দৃষ্টিতেই গ্রহণ করছি। আর আমরা এটাও জানি পৃথিবীতে মানুষকে এমন একটা সময়ে বসবাস করতে হয়েছে যখন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভাবে অনেক কষ্টের জীবন কাটাতে হয়েছে। কিন্তু সেই সময়টা থেমে থাকেনি। আস্তে আস্তে সবকিছুই উন্নতি হয়েছে। দিন, মাস, বছর, যুগ আর শতাব্দীর পরিক্রমায় আমরা এমন একটা সময়ে এসেছি যখন আমাদের জীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই বিজ্ঞানের ওপর নির্ভরশীল। এই যে বিজ্ঞান দ্বারা আমাদের জীবন আজ এত উপকৃত আর প্রভাবিত সেই বিজ্ঞান আবিষ্কারের পেছনে কাদের অবদান আমরা কি জানি? আর যতটুকু জানি তা কতটুকুইবা সঠিক? কোন বড় আবিষ্কার আর বিজ্ঞানীর উদাহরণ আসলেই আমরা পাশ্চাত্য, ইউরোপ, আমেরিকা আর নিউটন, আইনস্টাইনের নাম টেনে নিয়ে আসি।

দুর্ভাগ্য আমাদের মত মুসলমানদের যারা আজ এক প্রতারণার জালে আটকে আছি। মহান রাব্বুল আলামিন মানুষের জন্য পরিপূর্ণ জীবনব্যাবস্থা হিসেবে দিয়েছেন ইসলাম। এই জীবনব্যবস্থায় উঠে এসেছে মানুষের জীবন সম্পর্কিত সকল সমস্যার সমাধান। আর এই জীবনব্যাবস্থা পরিচালনার জন্য সংবিধানরুপে দেয়া হয়েছে মহাগ্রন্থ আর কোরআন। যাতে মানব জীবনের প্রাণীকুল, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ও জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কিত যাবতীয় প্রশ্ন আর সমস্যার সমাধান রয়েছে এই পবিত্র মহাগ্রন্থে। আর বিজ্ঞান কথাটাই এসেছে কোরআন থেকে।

আজ এই পৃথিবীতে যত বড় বড় বিজ্ঞানের আবিষ্কার আছে সেই সবের পেছনে আশি ভাগই মুসলমানদের অবদান। আর মুসলমানরা আবিষ্কারের মূল সূত্রগুলো নিয়েছিলো আল কোরআন থেকেই। সেটা শুরু হয়েছিল ইসলামের সোনালি যুগ থেকেই। কিন্তু সময়ের পরিক্রমায় মুসলমানদের দূর্বলতার সুযোগ নিয়ে চরম নীচু আর হীনমন্যতার পরিচয় দিয়েছে পাশ্চাত্যরা। যার প্রমাণস্বরূপ আজ আমরা চোখ বন্ধ করে ওদেরকে বিজ্ঞানের অগ্রপথিক বলে স্বীকৃতি দেই।

বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে আর একবিংশ শতাব্দীর শুরু এই মাঝামাঝি সময়টাতে তুরস্কের প্রধানমন্ত্রী ও বিশ্ব ইসলামী আন্দোলনের প্রবাদপুরুষ প্রফেসর ডক্টর নাজিমুদ্দিন এরবাকান যিনি ইসলামের জন্য ওনার নিজের জীবনটাই উৎসর্গ করে গেছেন। তিন তাঁর জীবনের দীর্ঘ সময় ধরে গভীর চিন্তা, সাধনা, ত্যাগ আর গবেষণা করে সমগ্র মুসলমানদের সামনে এটাই তুলে ধরতে চেয়েছেন আমরাই শ্রেষ্ঠ জাতি। মানবজাতির কল্যাণ হয়েছিল আমাদেরই মাধ্যমে। তিনি বুঝাতে চেয়েছিলেন মুসলিমরা অনুন্নত কোন জাতি নয়, মুসলিমদের আলোতেই আজ সারা বিশ্ব আলোকিত হয়েছে। ওনার এই সত্যটাকে সম্মানিত পাঠকদের কাছে তুলে ধরার জন্যই আমার এই আন্তরিক প্রয়াস। এর থেকে সম্মানিত পাঠকরা উপকৃত হলে আমার এই শ্রম সার্থক হবে। আল্লাহ আমাদের সঠিক সত্যটি জানার এবং আত্মবিশ্বাসী হওয়ার তাওফিক দান করুন। আমিন।

- মো: বুরহান উদ্দিন
১০ আগস্ট ২০১৪

www.pathagar.org

তুরস্কের সাবেক প্রধানমন্ত্রী নাজিমুদ্দিন এরবাকান ইসলামী আন্দোলনের এক দূরদর্শী সিপাহসালার। যার দূরদৃষ্টিতে আগামীর শতাব্দীগুলো ভেসে উঠেছে বহু সংখ্যা আর সম্ভাবনা নিয়ে। Islam & Science বইটি তার একটি বক্তব্যের বাংলা অনুবাদ। নাজিমুদ্দিন এরবাকানের বক্তব্যের এই গ্রন্থটি যে কোন পাঠকের হৃদয়ে এক নবজাগরণ সৃষ্টি করবে।

কে ছিলেন নাজিমুদ্দিন এরবাকান? ইঞ্জিনিয়ার প্রফেসর নাজিমুদ্দিন এরবাকান তুরস্ক ইসলামী আন্দোলনে ছিলেন এক জীবন্ত কিংবদন্তি। মানুষের অধিকার আদায়ে সংগ্রামী ও দৃঢ় সংকল্প বাস্তবায়নে পরিশ্রমী এ নেতা তুরস্কের কামালপন্থী সেনাবাহিনী এবং গণতন্ত্রবিরোধী শক্তির সাথে লড়াই করেছেন মজবুত মনোবল নিয়ে। তিনি তার দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে ধৈর্য্য, নিষ্ঠা এবং প্রজ্ঞা সহকারে তুরস্কের শিক্ষিত যুবসমাজ এবং বিভিন্ন পেশার মানুষের মাঝে ইসলামের সুমহান আদর্শ পৌঁছে দেয়ার সংগ্রাম চালিয়ে যান। বারবার পথরোধ করেও যার গতি কমানো যায়নি। জনতার ঈর্ষনীয় ভালোবাসায় যিনি নির্বাচিত হন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে। ১৯৭২ সালে নাজিমুদ্দিন এরবাকানের মিল্লি সালামত পার্টিকে ক্ষমতাসীন সামরিক বাহিনী সাংবিধানিক আদালতের মাধ্যমে নিষিদ্ধ করে। পরে তিনি গঠন করেন রেফা পার্টি। ১৯৮০ সালে সামরিক বাহিনী আবারও ক্ষমতায় এসে রেফা পার্টিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। কিন্তু দমাবার পাত্র ছিলেন না এরবাকান। সামরিক শাসন প্রত্যাহারের পর আবার তিনি গঠন করেন ফজিলা পার্টি। ১৯৯৬ সালে নির্বাচনে তার দল ভাল ফল করে এবং ধর্মনিরপেক্ষ ডানপন্থী একটি দলের সাথে কোয়ালিশন সরকার গঠন করে। প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর নাজিমুদ্দিন এরবাকান প্রতিবেশী মুসলিম দেশগুলোর সাথে ভালো সম্পর্ক গড়ে তুলেন এবং ধর্মীয় অধিকার ফিরিয়ে দেয়ার চেষ্টা শুরু করেন। ফলে সামরিক বাহিনীর চাপে ক্ষমতা থেকে সরে দাঁড়ান এ মহান নেতা। সেক্যুলার আদালত তার দলকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে এবং তার রাজনৈতিক তৎপরতার ওপর ৫ বছরের নিষেধাজ্ঞা জারি করে। ফলে ২০০২ সালের নির্বাচনে অংশ নিতে পারেননি তিনি। ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১১ এ মহান নেতা পৃথিবী থেকে বিদায় নেন।

এরবাকান তার বক্তব্যে বুঝাতে চেয়েছেন আজকের আধুনিক পৃথিবীতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নিয়ে ইউরোপের যে দাম্ভিকতা তার পেছনের ইতিহাস মুসলমানদের গৌরব আর ঐশ্বর্যের ইতিহাস। ইতিহাস মতে ৮ম থেকে ১৪শ শতাব্দী ছিল ইসলামের স্বর্ণযুগ। ইতিহাসে যে যুগটাকে মধ্যযুগ বলে সংজ্ঞায়িত করা হয়। এ সময়টাতে মুসলমানরা পৃথিবীকে শাসন করে জ্ঞানের শক্তি দিয়ে। ১২৫০ সালে স্পেনের টলেডোতে আজকের সভ্য ইউরোপের শিক্ষক মুসলমানরা প্রথম School of Orientation Studies স্থাপন করেন। কর্ডোভাতে পৃথিবীর ১ম বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেন মুসলমানরা। যেখানে সব সময় ইউরোপ, এশিয়া, আফ্রিকা মহাদেশের প্রায় দশ হাজার ছাত্র অধ্যয়ন করতো। এ সময় ইউরোপে খ্রিষ্টানদের সবচেয়ে বড় লাইব্রেরিটি ছিল রানী ইসাবেলার, যেখানে বই ছিল মাত্র ২০১টি। অপরদিকে তৎকালীন ফাতেমীয় সাম্রাজ্যের রাজধানী কায়রোতে মুসলমানদের পাঠাগারে জমা ছিল ১০ লক্ষ বই। এ বইটিতে উঠে এসেছে অশিক্ষিত বর্বর এবং বিবেকহীন মানুষকে ইসলামের আলো- শিক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞানের মহিমায় প্রশংসিত জাতিতে পরিণত করার ভিত্তি রচনা করে মুসলমানরাই। তাই আজকের তথাকথিত সভ্য দুনিয়ার মানুষ যারা মুসলমানদের সম্ভ্রাসী বা পিছিয়ে থাকা জাতি বলে গালাগাল দেয় তারা মুর্খ। তারা ইতিহাসকে চাপা দিয়ে সত্যকে আড়াল করে রাখছে। ওরা মুসলিম বিজ্ঞানীদের বইগুলো অনুবাদ করে নিজেদের নামে সংকলিত করছে। পদার্থ, রসায়ন, চিকিৎসা, বীজগনিত, ত্রিকোণমিতি, জ্যামিতি, স্থাপত্য বিদ্যা, ভূগোল, দর্শন, সাহিত্য, জ্যোতির্বিজ্ঞান, অর্থনীতি সকল ক্ষেত্রেই মুসলমানদের শুধু জয়জয়কার ছিল বললেই হবে না বরং এগুলোর আবিষ্কারও করে মুসলিম মণীষীরা। ইসলামের সুমহান শিক্ষায় শাণিত মানুষ যে গোটা সমাজকে আলোকিত করে তারই প্রমাণ রেখেছেন তৎসময়ের মেধাবী মানুষগুলো। যারা নিজেদের যোগ্যতা, মেধায় স্বমহিমায় চিরভাস্বর হয়েছেন। আলোকিত করেছেন একটি জাতিকে। তাই খেই হারানো মুসলিম জাতি যদি ঐক্যবদ্ধ হয়ে আবার সেই জ্ঞান ও চরিত্রের মাঝে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে পারে তবেই হারানো সালতানাতের মিনারে উড়বে কালেমার পতাকা। আমরাতো সেই জাতি, যাদের দীপ্ত পদভারে জমিনের ধূলি ওড়তো। যাদের কাফেলার উট জমিনে বসে গেলে ওই অঞ্চলের বাতিল শক্তির ঘুম নষ্ট হয়ে যেতো। খেলাফতের যুগে চীনের এক গোয়েন্দা কর্মী চীন সম্রাটের কাছে মুসলমানদের ব্যাপারে রিপোর্ট করেছিল, এদের রাত কাটে জায়নামাজে কেঁদে কেটে আর দিনের বেলার আকাশ অন্ধকার হয়ে যায় এদের ঘোড়ার খুরের দাপটে, উড়ন্ত ধুলায়; সুতরাং এদের কেউ পরাস্ত করতে পারবে না। ঈমানের দৃপ্ত চেতনায় বলীয়ান যে জাতি গোটা বিশ্বের দুয়ারে দুয়ারে শান্তি, নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধির পয়গাম পৌঁছে দিয়ে একটি পরাক্রমশালী জাতির মর্যাদায় অভিষিক্ত হয়েছিল সেই মুসলিম জাতি আজ শক্তিহীন, শোষিত। ইতিহাস বলে, এ জাতি কখনো পরাভব মেনে নিতে জানে না। তাই, আমরা বিশ্বাস করি ইসলামের সুমহান শিক্ষায় আবারও এ জাতি আলোড়িত করবে আগামীর পৃথিবী।

আশা করি, বইটি পাঠকমহলে চিন্তার খোরাক সরবরাহ করবে এবং বিশ্ব ইসলামী আন্দোলনের সংগ্রামী সিপাহসালারদের চিন্তা ও কর্ম তুলে ধরতে আমরা আমাদের প্রকাশণা অব্যাহত রাখবো, ইনশাআল্লাহ।

-মু. আতাউর রহমান সরকার
১০ আগস্ট ২০১৪

www.pathagar.org

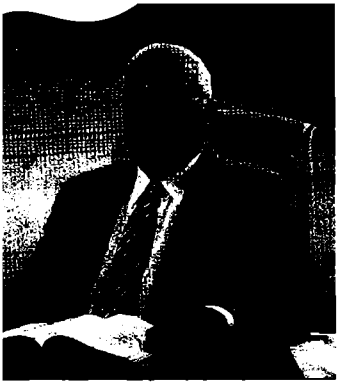

ইসলাম ও বিজ্ঞান

ইসলাম আমাদেরকে আখিরাতের জীবনের ওহির জ্ঞান, নৈতিক চরিত্র গঠন, মানসিক উন্নয়ন ও জ্ঞানের সকল ক্ষেত্র ও বিভাগের ব্যাপারে আমাদেরকে যে মূলনীতি সমূহ দিয়েছে আমরা সেগুলো জানি। কিন্তু আমরা ভাবি কি, ইসলাম প্রদত্ত মূলনীতি সমূহের বাইরেও নীতি পদ্ধতি রয়েছে। কি আছে ইসলামের বাইরে? আমেরিকা ও ইউরোপের বিজ্ঞানীরা নতুন নতুন আবিষ্কার নিয়ে আমাদের মাঝে উপস্থিত হচ্ছে। মঙ্গল গ্রহ ও চাঁদে যাচ্ছে। এগুলো যে মানুষ করছে তাদের এই সকল কর্মকাণ্ড কি কুরআনে প্রদত্ত আলোকে হচ্ছে? নাকি হচ্ছে না? আমি মনে করি আমরা এটা দাবি করি না অর্থাৎ কুরআনে প্রদত্ত জ্ঞানের আলোকে হচ্ছে না বলে আমরা মনে করি।

আজকে আমি আপনাদের সামনে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা পেশ করতে চাই। সংক্ষিপ্তভাবে আমি এর নামকরণ করেছি 'ইসলাম ও বিজ্ঞান'। আমি আমার আলোচনায় কেন এই বিষয়টিকে নির্বাচন করলাম ইনশাআল্লাহ আশা করি আমরা সকলেই উক্ত আলোচনা হতে বুঝতে পারব। এরকম একটি বিষয়ে আলোচনা করা আজকে সময়ের একটি দাবি। কেননা একজন মুসলিম হিসেবে দুনিয়ার অতীত ও বর্তমান সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করা আজ সময়ের একটি দাবি। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আমাদের সোনালি অতীতের চিন্তা চেতনাকে লালন করতে না পারার কারণে আমাদেরকে সর্বদাই ভিত্তিহীন কিছু চিন্তাধারার ও চিন্তাচেতনার মুখোমুখি হতে হয়েছে। তবে এটা সত্য যে, ভিত্তিহীন চিন্তার সাথে আমাদের চিন্তার এই সংগ্রাম আমাদের মুসলমানদের সম্মান ও মান মর্যাদাকে বৃদ্ধি করেছে। অপরদিকে পাশ্চাত্যের এই ভিত্তিহীন চিন্তাধারা আমাদের দেশে আমাদের ধর্ম আমাদের সংস্কৃতিকে জানার ক্ষেত্রে একটি বড় বাধা হিসাবে দাঁড়িয়েছে। আজ জ্ঞান ও বিজ্ঞান প্রসারের ক্ষেত্রে ইসলামের ভূমিকা কী ছিলো এবং ইসলাম জ্ঞান ও বিজ্ঞানে কী অবদান রেখেছে সে সম্পর্কে আলোকপাত করব। আমি কেন আজ এই বিজ্ঞানকে বেছে নিলাম? আমি নিশ্চিত যে, আমাদের মধ্যে যারা উপস্থিত তাদের অধিকাংশই এই সম্পর্কে জানি না। কেন আমরা জানি না? কারণ আমরা এই সম্পর্কে জানার ও শেখার সুযোগ পাইনি।

আমাদের মূল বিষয়ে যাওয়ার পূর্বে, একটি বিষয়কে ব্যাখ্যা করে আমরা আমাদের মূল বিষয়ের গুরুত্বকে জোর দিয়ে বুঝাতে চাই। ইসলামী চিন্তা ও চেতনায় কিন্তু কোনো প্রকারের ঘাটতি নেই। কিন্তু ভুল পদ্ধতির কারণে আমরা ভুল পথে পরিচালিত হতে পারি। আর সেটা হলো ইসলাম এখনো তার পূর্ণ স্বতন্ত্র সত্তা নিয়ে আমাদের মাঝে বিরাজমান। ইসলাম আমাদেরকে আখিরাতের জীবনের ওহির জ্ঞান, নৈতিক চরিত্র

www.pathagar.org

গঠন, মানসিক উন্নয়ন ও জ্ঞানের সকল ক্ষেত্রে ও বিভাগের ব্যাপারে আমাদেরকে যে মূলনীতিসমূহ দিয়েছে আমরা সেগুলো জানি। কিন্তু আমরা ভাবি কি, ইসলামপ্রদত্ত মূলনীতিসমূহের বাহিরেও নীতিপদ্ধতি রয়েছে। কি আছে ইসলামের বাইরে? আমেরিকা ও ইউরোপের বিজ্ঞানীরা নতুন নতুন আবিষ্কার নিয়ে আমাদের মাঝে উপস্থিত হচ্ছে। মঙ্গল গ্রহ ও চাঁদে যাচ্ছে। এগুলো যে মানুষ করছে তাদের এই সকল কর্মকাণ্ড কী কুরআনে প্রদত্ত আলোকে হচ্ছে? নাকি হচ্ছে না? আমি মনে করি আমরা এটা দাবি করি না অর্থাৎ কুরআনে প্রদত্ত জ্ঞানের আলোকে হচ্ছে না বলে আমরা মনে করি। আমরা বলে থাকি যে, তারা সৌরজগৎ-এর প্রতিটি সেকেন্ডকে হিসাব করে এটা বের করে থাকেন যে, চাঁদে যাব এই সময়ে, মঙ্গলে যাব এই সময়ে এমনকি তারা তাদের বের করা সময়ে পৌঁছতে ঠিকই সক্ষম হচ্ছে। তাদের এই গবেষণা বা কর্মতৎপরতার দ্বারা এটা প্রতীয়মান হয় যে, তাদেরও একটা জ্ঞানের উৎস আছে বা সত্যের উৎস আছে। আর এর মাধ্যমে আমরা ইউরোপীয় ও আমেরিকানদেরকে একটি মূল্যায়ন দিয়ে থাকি যে, ইসলামের বাইরেও চিন্তা ও সত্যের উৎস রয়েছে, না হলে তারা এই সকল কাজ করতে সমর্থ হয় কিভাবে?

এখন আমরা আমাদের এই বক্তব্যে যুক্তির আলোকে এই কথা প্রমাণ করার চেষ্টা করব যে, 'ইসলামের বাইরে সত্যের কোনো উৎস নেই' ইসলাম ছাড়া আর কোনো সত্য নেই। আচ্ছা তাহলে ইউরোপের বিজ্ঞানীরা অতি আশ্চর্য যে কাজগুলো করছে তাহলে সেগুলো কী? এগুলো কোথা থেকে জনসমক্ষে আসছে? তাদের এই সকল কার্যক্রমের উৎস বা ভিত্তিমূলে কী আছে? ইউরোপিয় বিজ্ঞানীদের আবিষ্কার ও তাদের চিন্তাধারা ও ইসলামী মূলনীতির মধ্যে কি সম্পর্ক বিদ্যমান সেটাকে বের করার চেষ্টা করব। আমি আমার কথাকে এইভাবে শুরু করতে চাই যে, আমরা যদি এখন বের হয়ে দুনিয়ার বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করি, যখন বাইরে থেকে দেখি তখন আমরা বলে থাকি 'উ- আউ কত বড় বিল্ডিং! কত বিশাল সেতু! এগুলো কিভাবে বানালো? তারা কিভাবে তাদের তৈরি এই সকল বিমানে করে চাঁদে যায়? মঙ্গলে যায়? এই সকল বড় বড় বিজ্ঞানাগারে তারা কিভাবে কাজ করে থাকে?' এই সকল কথা বলতে বলতে আমরা এই সকল জিনিসকে পর্যবেক্ষণ করে থাকি। আমেরিকা থেকে চাঁদে গমনকারী যে কোনো রকেট-এর নিয়ন্ত্রণকারী কোনো অফিসে যদি গিয়ে সেখানে কর্মরত একজনের সাথে কথা বলি এবং সে ব্যক্তির জ্ঞানের গভীরতা কতটুকু তা যদি পরীক্ষা করতে শুরু করি আমরা সহজেই সেই ব্যক্তিকে খুব শ্রদ্ধার সাথে দেখতে থাকব।

চলুন দেখা যাক আমাদের দৃষ্টিতে সেই বড় ব্যক্তিটিকে একটু পরখ করি। যে সকল বিজ্ঞানীরা সেখানে কাজ করেন ও সেই সকল বিজ্ঞানাগারকে রক্ষণাবেক্ষণ করেন তার কাছে বসে যদি তাকে প্রশ্ন করি আপনি এখানে কী করেন? সে নিশ্চয় বলবে: 'আমি অমুক রকেট-এর অমুক গতি পথকে নিয়ন্ত্রণ করি' কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করেন? 'সে উত্তর দিবে যে আমি শুধুমাত্র এই যন্ত্র বা যন্ত্রাংশটুকুকে নিয়ন্ত্রণ করি। আমরা যদি তাকে প্রশ্ন

www.pathagar.org

করি যে এই যন্ত্র বা যন্ত্রাংশটি কিভাবে তৈরি হলো? সে হয়ত কিছু সূত্রের কথা বলবে বা কিছু সূত্র লিখে দিবে। সে হয়ত এই সূত্রগুলোর আগে কিছু সংখ্যা অথবা সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহার করবে। তখন আমরা আমাদের নিজেদের অজান্তেই বলে উঠব যে, আমরা যা কোনো দিন বুঝি না বা জানি নাই সেরকম একটি বিষয় সম্পর্কে উনি আমাদের অবহিত করছেন। তথাপি, একজন মুসলিম হিসাবে আমরা যখন এরকম একটি ব্যাপারকে মোকাবেলা করব, তখন আমাদের উচিত হবে না যে, এর প্রতি খুব বেশি গুরুত্বারোপ করা। বিজ্ঞানাগারে কর্মরত ব্যক্তিকে যখন আমরা প্রশ্ন করব তিনিও তখন আমাদের সাথে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক সূত্রাবলি নিয়ে আলোচনা করবেন। চলুন এখন আমরা তার প্রদর্শিত সেই সূত্রাবলি নিয়ে আলোচনা করি।

দেখুন, সেই বিজ্ঞানী আমাদের যে সূত্র থেকে কথা বলেন বা দেখান না কেন সে সূত্রের গঠন ও সেই সূত্রটি আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ নয়। সত্যিকার অর্থে তাদের তৈরি উদ্ভাবিত সে সকল সূত্র ও সূত্রাবলি শুধুমাত্র তাদের চিন্তার একটি ব্যাখ্যামাত্র। উদাহরণস্বরূপ সেই বিজ্ঞানীর চাঁদে রকেট প্রেরণের হিসাবের সাথে সাধারণ একটি পাথরের একই উচ্চতা থেকে মাটিতে পড়ার যে হিসাব তার থেকে ভিন্ন নয়।

যারা শুধুমাত্র পদার্থ বিজ্ঞান পড়ছে অথবা শুধুমাত্র কলেজের গণ্ডিকে পেরিয়েছে তারাও এই সময়টাকে হিসাব করতে পারে। আমরা যদি উচ্চমাধ্যমিক পাস অথবা উচ্চমাধ্যমিকে অধ্যয়নরত একজন ছাত্রকে প্রশ্ন করি যে, দশ মিটার উচ্চতা থেকে একটি পাথর মাটিতে পড়তে কতটুকু সময় লাগবে? এই একই প্রশ্ন যদি আমরা কোনো মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারকে করি তারা দুইজনেই একই পদ্ধতিতে এই প্রশ্নের সমাধান করবে। তারা একটি সূত্রকে ব্যবহার করবে আর সেটা হলো : H= 1/2G এই সূত্রে যেখানে S হলো সময় এবং আমরা এটাকে $\sqrt{2H/G}$ এইভাবে লিখতে পারি। যেহেতু H হলো ১০ মিটার, এবং আমরা G কেও ১০ ধরতে পারি যেখানে S সময় সমান ১.৪১। ফলাফল হিসাব করে দেখা গেল ১০ মিটার উচ্চতা থেকে একটি পাথরকে ফেলে দিলে ১.৪১ সেকেন্ড পর এটি মাটিতে পৌঁছে। সত্যিকার অর্থেই আমরা একটি পাথরকে ১০ মিটার উচ্চতায় জানালা থেকে মাটিতে নিক্ষেপ করলে আর আমরা যদি টাইম ওয়াচ দিয়ে হিসাব করি তাহলে একই সময় দেখতে পাই।

এখানে কী এমন বিশেষত্ব আছে যে, বিজ্ঞানী সেটা জানে? এটা খুবই সহজ একটা ব্যাপার যে, আমরা যদি এটাকে বিশ্লেষণ করি তাহলে যা পাই তাহলো- এই হিসাব করার সময় আমরা যদি প্রশ্ন করি, এই হিসাব আপনি কিভাবে করলেন? এই ফর্মুলাটাকে কোথায় পেলেন? সে আমাদেরকে বলবে কি এই পাথরটি এখান থেকে নিচে পড়ার সময় ভূমি এটাকে আকর্ষণ করে। আর এখানে মূল বিষয় হলো মধ্যাকর্ষণ শক্তি। একটি শক্তি এটাকে তার দিকে আকর্ষণ করে। পাথরটি মাটিতে পড়ার সময় এটা তরঙ্গায়িত হয়। আর এই গতি তরঙ্গের কারণেই এটাতে একটা গতির সৃষ্টি। আর এর গতিবেগের আকর্ষণ (Magnitude) উপর এবং নিচ উভয় দিকেই সমান। এই শক্তি

www.pathagar.org

(Force) উভয় দিকেই সমান কেন? এর কারণ হলো ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া। সত্যিকার অর্থেই কী এটা? সম্ভবত তিনি আমাদেরকে আরও অন্যান্য বিভিন্ন উদাহরণ দিবেন। তিনি বলবেন যে, প্রতিটি ক্রিয়ার-ই সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে। এই সূত্রটি প্রতিটি পদার্থের ও প্রতিটি ঘটনার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। আর এই সূত্রটি পৃথিবীর সব জায়গায় গ্রহণযোগ্য আর বিভিন্ন ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার আলোকে আমরা এর সত্যতা পাই।

আর এটা গোটা দুনিয়াতেই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সূত্র নামে পরিচিত, যে প্রতিটি ক্রিয়ারই একটি সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে। আমরা যখন এমন কোনো সমস্যায় পড়ি যেটা পদার্থবিদ্যার সাথে সম্পৃক্ত তখন আমরা পদার্থবিজ্ঞানের সূত্রাবলিকে ব্যবহার করে থাকি। অন্যান্য হিসাবের ক্ষেত্রেও আমরা অন্যান্য সূত্রাবলিকে ব্যবহার করে থাকি। এগুলোর মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ সূত্র হলো 'পদার্থকে সৃষ্টি করা যায় না বা ধ্বংস করা যায় না, এক অবস্থা হতে অন্য অবস্থায় রূপান্তর করা যায় মাত্র। এটা হলো ভরের নিত্যতা সূত্র। আর অপরটা হলো শক্তির সৃষ্টির বা বিনাশ নেই শুধুমাত্র এক রূপ হতে অন্য রূপে রূপান্তর করা যায় মাত্র। এটাকে বলে শক্তির নিত্যতা সূত্র।

আজকের পৃথিবীতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে যতো কিছুই আবিষ্কার হচ্ছে ও যতো মৌলিক ধারণার উৎপত্তি হয়েছে এর মূলে হলো এই সূত্রগুলো। পদার্থ, রসায়ন ও যান্ত্রিক সকল ক্ষেত্রেই এ সূত্রগুলোকে ব্যবহার করা হচ্ছে। এ সূত্র তিনটির বাইরে অন্য কোনো সূত্র নেই যা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়নে এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণার কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। এই তিনটি সূত্রই হলো বিজ্ঞানের মূল। এই অবস্থায় পাশ্চাত্যের যে কোনো বিজ্ঞানী যখন হিসাব করে আমাদেরকে তার প্রতিভা বা কেরামতি প্রদর্শন করে জেনে রাখবেন যে যতো কিছুরই হিসাব করুন না কেন যতো উদ্ভাবনী শক্তিই প্রদর্শন করুন না কেন সকল কিছুর পেছনেই তার সেই তিনটি সূত্রই বিরাজমান। সেগুলোর মধ্যে প্রথমটি হলো ভরের নিত্যতা সূত্র (Conservation of mass), দ্বিতীয়টি হলো শক্তির নিত্যতা সূত্র (Conservation of Energy) আর তৃতীয়টি হলো ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার সূত্র (Action-Reaction)।

এখন সকল হিসাব নিকাশ ও তার ফলাফল পাওয়ার পর যে বিজ্ঞানী এটার হিসাব নিকাশ করেছেন ও এই সমস্যা সমাধান করেছেন তাকে যদি প্রশ্ন করা হয় যে, 'আপনি যখন এই সমস্যাগুলির সমাধান করেন তখন আপনি কিছু টার্ম ব্যবহার করেন, যেমন, শক্তি, গতি, পদার্থ-এগুলোর দ্বারা আপনি কী বুঝাতে চান?' সে নিখুঁতভাবে তার হিসাব সম্পাদন করতে পারবে কিন্তু সে এই টার্মগুলোর সঠিক ব্যাখ্যা কখনোই দিতে পারবে না। সে এগুলোকে ব্যবহার করছে, এগুলোর দ্বারা তার সমস্যার সমাধান করছে কিন্তু অতীব আশ্চর্যের বিষয় হলো সে এগুলোর সন্তোষজনক কোনো ব্যাখ্যা দিতে পারছে না। সে কেন দেখাতে পারে না? দেখুন-উদাহরণস্বরূপ আমরা যখন পদার্থের কথা বলি এটা কী করে হয় যে মানুষ পদার্থ দেখাতে পারবে না? তাহলে পদার্থ কী? এখানে টেবিল, চেয়ার ইত্যাদি যেগুলো দেখা যাচ্ছে এগুলোই তো পদার্থ।

www.pathagar.org

কিন্তু আমরা যখন এটাকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখি তখন এটা ততোটা সহজ নয়। একটা টেবিলকে যখন পদার্থের উদাহরণ হিসাবে দেখানো হলো তখন আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে এই টেবিলটা কী? এইভাবে যখন আমরা প্রশ্ন করতে শুরু করি আর টেবিলকে ঘিরে বড় একটি মাইক্রোস্কোপ যন্ত্র দিয়ে যদি পরীক্ষা করতে শুরু করি যে, পদার্থ আসলে কী? পদার্থ কী এটা জানার জন্য যখন আমরা মাইক্রোস্কোপ দিয়ে দেখতে শুরু করি তখন টেবিলের উপর আমরা বিভিন্ন ধরনের কাঠিন্যতা দেখতে পাই। যখন আমরা এর কাঠিন্যতাকে ভেদ করে এর ভেতরে প্রবেশ করি তখন কাষ্ঠ বা কাষ্ঠ খণ্ডের তৈরি এই টেবিলের কাঠগুলোতে আমরা বিভিন্ন কোষ দেখতে পাই। এই কোষগুলোর অভ্যন্তরে যখন আমরা ধীরে ধীরে প্রবেশ করি এই কোষগুলোর মধ্যে বিভিন্ন জৈব পদার্থকে দেখতে পাই এবং জৈব পদার্থগুলোর ভেতরেও রয়েছে বিভিন্ন অণু-পরমাণু।

যদি আমরা এই সকল অণুগুলোকে মাইক্রোস্কোপ যন্ত্র দিয়ে নিরীক্ষণ শুরু করি তাহলে আমরা দেখতে পাই যে, পদার্থের অভ্যন্তরে যে অণুগুলো রয়েছে সেগুলো আবার পরমাণু থেকে তৈরি। পরমাণু কী? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করার জন্য যখন আমরা পরমাণুর ভেতরে প্রবেশ করি তাহলে দেখতে পাই যে, পরমাণুর গঠন প্রণালী ও এর কার্যবিধি সূর্য এবং তার চতুষ্পার্শ্বে আবর্তিত ঘূর্ণায়মান বিভিন্ন নক্ষত্রসমূহের মতই। সূর্য যেমনিভাবে কেন্দ্র তেমনিভাবে এরও একটি কেন্দ্র রয়েছে। আর একে বলা হয় প্রোটন। এই প্রোটনকে কেন্দ্র করে এর চতুপার্শ্বে আবর্তিত হয় নিউট্রন যেমনিভাবে সূর্যকে কেন্দ্র করে অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহ আবর্তিত হয়। সূর্যের চারপাশে যেমনিভাবে পৃথিবী নামক গ্রহ ও অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহ আবর্তিত হয় তেমনিভাবে টেবিলের অভ্যন্তরে প্রতিটি পরমাণুর কার্যপ্রণালী একই নিয়মে চলে।

আচ্ছা এই পরমাণু আসলে কী? যখন আমরা মাইক্রোস্কোপ দিয়ে এটাকে পর্যবেক্ষণ করি, তখন আমরা দেখতে পাই যে, ইলেকট্রন এবং প্রোটনের মধ্যে রয়েছে একটি বিশাল দূরত্ব। এই একই কার্যপ্রণালী আমরা সৌরজগৎ এর ক্ষেত্রেও দেখতে পাই। সূর্য এবং তারকাসমূহের মধ্যেও রয়েছে বিশাল এক দূরত্ব। যখন আমরা টেবিলের অভ্যন্তরে প্রবেশ করি তখন আমরা এখানে ফাঁকা জায়গা দেখতে পাই। আমরা খোলা চোখে দেখি যে এটি কোনো বস্তু দ্বারা পরিপূর্ণ কিন্তু বাস্তবিক অর্থে এটি বস্তু দ্বারা পরিপূর্ণ নয়। এর ভেতরে রয়েছে ফাঁকা। এখানে রয়েছে শুধুমাত্র ইলেকট্রন প্রোটন। নিউক্লিয়াস ও ইলেকট্রন-এর মধ্যকার দূরত্ব সূর্য এবং তারকাদের মধ্যে অবস্থিত দূরত্বের দশগুণ। আমরা এটাকে পরিপূর্ণ ভাবতাম। হ্যাঁ যখন আমরা বাহির থেকে দেখি তখন এটাকে পরিপূর্ণই (full) দেখতে পাই। কেননা আমরা এর ভেতরে দেখতে সক্ষম নই। আমাদের চর্মচক্ষু এটাকে দেখতে সক্ষম নয় যে এর ভেতরে পুরোটাই ফাঁকা (empty)

এখন যখন আমরা আমেরিকার সেই বিজ্ঞানাগারে গবেষণারত বিজ্ঞানীটিকে নিয়ে এসে একটি মাইক্রোস্কোপ হাতে দিয়ে এই ফাঁকা জায়গা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি যে, জনাব আপনি আমাদেরকে হিসাব দেখানোর সময় পদার্থ সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন, এখন সেই

www.pathagar.org

পদার্থ (material) গুলো কোথায়? সে এর কোনো উত্তর দিতে সক্ষম হবে না। কেননা এই ইলেকট্রন ও প্রোটনগুলো হলো পরমাণুর সাধারণ উপাদান, এদের কোনো ওজন ও উল্লেখযোগ্য কোনো আয়তন নেই (do not have important weights and volume)। উদাহরণস্বরূপ যদি আমরা দুনিয়ার সকল স্বর্ণের কথাই ধরি, যদি আমরা স্বর্ণের পরমাণুগুলোর অভ্যন্তরে ফাঁকা জায়গা গুলোকে পরিপূর্ণ করার জন্য পরমাণুগুলোকে সংকোচিত করতে পারি তাহলে সকল স্বর্ণ শুধুমাত্র একটি আঙ্গুল (thumble)-এর মাথাকে ঢাকতে যে ফাঁকা জায়গা প্রয়োজন সেটাকে পরিপূর্ণ করতে পারে কিন্তু এটা আমাদের সকলেরই জানা যে, দুনিয়াতে যে পরিমাণ স্বর্ণ রয়েছে এটা লিবসন ও সাইবেরিয়ার মধ্যবর্তী জায়গাকে পরিপূর্ণ করতে পারবে। চিন্তা করুন এটা গোটা ইউরোপকে পূর্ণ করে দিতে পারবে। যখন আমরা নিউক্লিয়াস ও ইলেকট্রন-এর মধ্যকার এই দূরত্বকে কমিয়ে নিয়ে আসি তখন গোটা দুনিয়ার স্বর্ণ নামক এই বস্তুকে একটি অঙ্গুলিস্থান (thumble) এ জমা করতে পারি। এটা আমাদেরকে দেখিয়ে দেয় যে, শুধুমাত্র হালকা বা সাধারণ পদার্থ সমূহ নয় বরং স্বর্ণের মতো ভারী বস্তুকেও শূন্যতা থেকে গঠন করা হয়েছে। যদিও বিজ্ঞানীরা বলে থাকেন যে, বাস্তবিকভাবে ইলেকট্রন কোনো একটি নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান করে না। তাহলে তারা কোথায় অবস্থান করে? দাবি করা হয়ে থাকে যে, যেখানে ইলেকট্রন-এর কোনো অস্তিত্ব নেই আছে শুধুমাত্র তরঙ্গ (wave), তরঙ্গ (wave) নিউক্লিয়াস-এর চতুষ্পার্শে আবর্তিত হয়। আধুনিক বিজ্ঞানের মতে সেখানে কোনো বস্তুর/পদার্থের (material) অস্তিত্ব নেই। তাহলে এটা কোন্ প্রকারের তরঙ্গ? যদি আমরা এই অডিটরিয়ামের একপাশ থেকে অপরপাশ পর্যন্ত রশি টানিয়ে দেই এবং এর একপাশ থেকে এটিকে তরঙ্গায়িত করি তাহলে এটি অন্য প্রান্তে গিয়ে পৌঁছে। এখানে আপনারা গ্রহণ করেন যে ইলেকট্রন আবর্তিত হয়, কিন্তু না মূলত ইলেকট্রন আবর্তিত হয় না। তাহলে কী আবর্তিত হয়? আবর্তিত হয় মূলত এই তরঙ্গ। এখানে পদার্থ বলতে কিছু নেই।

তথাপি আজকের পাশ্চাত্য বিশ্ব কিছু পরিকল্পনা গ্রহণ করে ও মনে হয় যে তারা কিছু কাজের প্রজেক্টও গ্রহণ করেছে। কিন্তু তারা এটা অনুধাবন করে না যে, তা কি ব্যবহার করছে। এমনকি তারা এটাও উপলব্ধি করে না যে, তারা কিসের উপর ভিত্তি করে তাদের কার্যকলাপ পরিচালিত হচ্ছে। আজকে পাশ্চাত্যের একজন মানুষের পদার্থ (material), শক্তি (energy) ও বল (Force) সম্পর্কে ধারণা নেই। আমরা কেন আজকে এর উপর এতো দৃষ্টিপাত করছি? এই মুহূর্তে কি এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ কোনো বিষয়? আমি এখন অন্য একটি ব্যাপারকে তুলে ধরতে চাই।

যখন আমাদের মুসলিম ভাইয়েরা পাশ্চাত্যের কোনো ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ করে বা পাশ্চাত্যের কারো সাথে কোনো ব্যাপারে আলোচনায় আসে তখন তাদেরকে পাশ্চাত্যের আচরণকে সহ্য করতে হয়। তারা মুসলিমদেরকে তাদের তুলনায় পাশ্চাদমুখী ও নিকৃষ্ট ভাবে। অথচ তারা যে নিজেরাই ছোট (inferior) এটা তারা জানে না। আজকের এই

www.pathagar.org

বক্তব্যে আমি এটা প্রমাণ করব যে, মুসলিমদেরকে যারা নিকৃষ্ট/ছোট (inferior) ভাবে তারাই বরং ছোট, মুসলিমরা ছোট নয়।

তারা নিজেদেরকে না চিনেই, নিজেদের অবস্থানকে দৃষ্টিপাত না করেই, তার অবস্থান কি? এটাকে উপলব্ধি না করেই তারা বলে থাকে যে, বিজ্ঞান হলো জ্ঞানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শাখা। তাদের মতে বিজ্ঞান কী? দেখুন তারা চাঁদে যায়, তারা মঙ্গলসহ মহাকাশে গিয়ে থাকে। কিন্তু কোন পথে, কিভাবে, কোন উপায় অবলম্বন করে থাকে, তারা এ সম্পর্কে জানে না। যখন আপনি তাদেরকে এই সকল হিসাবের উৎস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন সে এর জবাব দিতে পারবে না। যদিও তারা দিতে পারে তবে তারা বলবে যে, এ সকল কিছুর উৎস হলো কিছু সূত্রমালা। এই সূত্রগুলো থেকেই তারা তাদের ধারণা ও অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। তারা বলে যে, এটা আমাদের বদ্ধমূল বিশ্বাস যে, এই সূত্রগুলোর উপর ভিত্তি করেই আমরা সকল কিছুই উদ্ভাবন করে থাকি। এই সূত্রগুলো কী? এই সূত্রগুলো হলো '১. প্রত্যেকটি ক্রিয়ার-ই সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে। ২. কোনো পদার্থ ও শক্তিকে সৃষ্টি ও ধ্বংস করা যায় না শুধুমাত্র এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় রূপান্তর করা যায় মাত্র।" আচ্ছা আপনার মতে যে পদার্থের কথা বলছেন এই পদার্থ বলতে কী বুঝায়? শক্তি (energy) ও বল (force) বলতে কী বুঝায়? যখন আমরা এই সকল প্রশ্ন তাদের সামনে পেশ করি তারা এর সঠিক কোনো জবাব সংক্ষিপ্ত ও সঠিকভাবে পেশ করতে পারে না। কেন পারে না তারা? কারণ হলো সত্যিকারের জ্ঞান বলতে কী বুঝায় তারা তা জানে না। তারা এই ছোট ব্যাপার গুলোকেই সবচেয়ে বড় জ্ঞান বলে ধারণা করে থাকে। সত্যিকার অর্থে বিজ্ঞান শুরু হয় মূলত এখান থেকে। যেখানে এসে তারা থেমে যায় সেখান থেকেই আসল জ্ঞান ও বিজ্ঞান শুরু হয়। তারা কিভাবে আমাদেরকে বিজ্ঞান শিক্ষা দেবে যেখানে তারা পদার্থ/বস্তু সম্পর্কেই অবগত নয়। তেমনিভাবে সে জানে না যে, শক্তি কী (energy), বল (force) কী ও ভর (mass) কী? পদার্থ বা বস্তু (Subtance matarial) নামে কোনো কিছু আছে না কি নাই? তাহলে তোমরা আমাদেরকে শিক্ষা দিতে পার না। দেখুন আপনাদের কেউ বলে এভাবে, কেউ বলে সেভাবে, আবার কেউ বলে হ্যাঁ পদার্থ (Subtance matarial) আছে। আবার কেউ বলে না পদার্থের (Subtance) এর কোনো অস্তিত্ব নেই। আবার কেউ বলে এটা হলো তরঙ্গ। এটা ওটা নানান কিছু।

আপনারা জেনে থাকবেন যে, এদের মধ্যে অন্যতম হলো আইনস্টাইন (Einstein), সে হলো একজন ইয়াহুদি বিজ্ঞানী। সে তার সারা জীবন এই সকল গবেষণায় কাটিয়েছে। সে তার জীবনের শেষ প্রান্তে এসে বলেছিল আমি প্রায় আমার সারা জীবন বিজ্ঞান গবেষণায় কাটিয়েছি। আমি শক্তি (energy), বল, (force) এবং পরমাণু (Atom) সম্পর্কে অধ্যয়ন করেছি, এগুলো নিয়ে হিসাব নিকাশ করেছি। কিন্তু জীবনের শেষ প্রান্তে এসেও এগুলো সম্পর্কে আমি পুরোপুরি অবগত হতে পারলাম না। তথাপি আমি আপনাদেরকে একটা বিষয়ে অবগত করতে চাই। যদি আমরা শক্তি (energy), বল

www.pathagar.org

(force), পদার্থ (Substance) এর জায়গায় অন্য কোনো বৈজ্ঞানিক ধারণাকে গ্রহণ করতাম তাহলে কি আমরা একই ফলাফল পেতাম? নাকি সহজ কোনো হিসাব বের করতে পারতাম? এটা আমরা জানি না। কিন্তু আমি ধারণা করি যে, পদার্থ (Substance), শক্তি (energy), বল (force) এগুলো একে অপরের থেকে ভিন্ন নয়।

আমি এগুলোকে একই ব্যাপার মনে করে থাকি। আমি মনে করি যে, এগুলো একই জিনিস আর সেটা হলো শক্তি (energy) এটি কখনো পরিণত হয় পদার্থে (Substance) আবার কখনো বা বলে (force)। আমি এটা ধারণা করতে পারি যে, এটা কী? কিন্তু আমি এটাকে বিশ্লেষণ করতে পারি না। যেমনিভাবে আমরা যখন পরমাণু (Atom) কে বিভিন্ন খণ্ডে বিভক্ত করি তখন এটা শক্তিতে রূপান্তরিত হয় তেমনিভাবে শক্তিকে (energy) যখন একত্রিত করা হয় তখন এটা পদার্থে (Substance) পরিণত হয়। তথাপি পদার্থের ক্ষেত্রে কী ঘটে? শক্তি কী? এগুলোর আসল কোনটি? আজ আমরা এই সকল প্রশ্নের উত্তর জানার জন্য যদি পাশ্চাত্যের জ্ঞানে পরিপূর্ণ পাণ্ডিত্য অর্জনকারী আইনস্টাইনকে জিজ্ঞাসা করি তিনিও এসকল প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন না। অবশেষে তাদের জ্ঞানের অপূর্ণতা স্বীকার করতে বাধ্য হন। মুসলিমদেরকে নীচু (inferior) ভাবে দেখার পূর্বে তাদের নিজেদের এই হীনতাকে পর্যালোচনা করা উচিত। তারা সর্বদাই একটি কঠিন সমস্যা মোকাবেলা করে থাকে। আর তাদের এই সমস্যার (Complexity) মূল কারণ হলো সঠিক জ্ঞানের অভাব। পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানীগণ বিভিন্ন সূত্রকে অবলম্বন করে তাদের হিসাব নিকাশ করে থাকে কিন্তু আজকে তারা তাদের হিসাব নিকাশের বিভিন্ন ক্ষেত্রেই ব্যর্থতার পরিচয় দিচ্ছে। এজন্য আজ আমরা তাদের মুখে বিভিন্ন হতাশার বাণী শুনতে পাই, কিন্তু তারা প্রকৃতপক্ষে এর মূল কারণ অনুসন্ধান করে না। আমরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আমাদের ছাত্রদেরকে ডক্টরেট করিয়ে থাকি। পাশ্চাত্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও ডক্টরেট (PhD) করার দিকে উৎসাহিত করা হয়ে থাকে। গবেষণার সময় বা গবেষণার বিষয়ে আমাদের এমন অনেক সমস্যার মুখোমুখি হতে হয় যেটার সমাধান আমরা কেউ দিতে পারি না। কিন্তু প্রায় সময়ই আমরা ব্যাপারটাকে এড়িয়ে যাই কিংবা গোপন রাখি। কিন্তু এটা আমাদের বলা একান্ত প্রয়োজনীয় এবং সে সাথে মানুষের অক্ষমতাটাও তুলে ধরা।

এখন পাশ্চাত্যের নাম করা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করেছে এমন কারো সাথে যদি এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করি আর আপনারা যদি আমাদের বিচারক থাকেন। আর আমি যদি বলি "পাশ্চাত্যের করা বিভিন্ন হিসাব নিকাশ, তাদের ব্যবহৃত সূত্রাবলি সম্পর্কে পুরোপুরিভাবে তারা অবহিত নয়, দ্বিতীয়ত, তারা তাদের এই সকল হিসাব নিকাশ গবেষণার সময় সর্বদাই একটি জটিলতায় (Complexity) থাকে। তারা এই সকল জটিলতার সমাধানে মোটেও সক্ষম নয়।" আচ্ছা তাহলে তারা তাদের ডক্টরেটে (PhD) গবেষণায় কী করে থাকে? আমি আপনাদেরকে বুঝাবো তারা বা আমরা কী করে থাকি।

www.pathagar.org

উদাহরণস্বরূপ আমার গবেষণার বিষয় হলো সাগরে জাহাজ চালনা পদ্ধতি বা গতিবিধি এর পেছনে তরঙ্গগুলো কিভাবে গঠিত হবে বা কিভাবে এর তরঙ্গগুলো সাগরে মিশে যাবে? আমাদের প্রচলিত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট ডিগ্রি গ্রহণ করা বা আমরা যেটাকে জ্ঞান বলে অভিহিত করে থাকি সে ব্যাখ্যা মতে, আমরা জাহাজকে সাগরে চালনা করি, জাহাজের পেছনের ঢেউগুলোর ছবিগুলো সংগ্রহ করার পর সকলেই টেবিলে বসে পর্যালোচনা করি যে, জাহাজ পরিচালনার পর তরঙ্গগুলোর এইভাবে প্রবাহিত হয়েছে। আমাদের এই হিসাবকে পূর্ণ করার জন্য সেই সূত্র তিনটিকে যদি লিখি এবং লেখার পর যদি সমস্যাটিকে সমাধান করার জন্য চেষ্টা করি। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য আমরা এর কোনো সমাধান দিতে পারি না। কেননা আমাদের মাথায় এর যুক্তি বুঝে আসে না। আমরা এর নিগূঢ় তথ্য ও তত্ত্ব নির্ভুলভাবে না জানার কারণেই আমরা এর সঠিক কোনো উত্তর খুঁজে পেতে সক্ষম নই। এরপর আমরা সহজ রাস্তা বের করার চেষ্টা করি কিন্তু সত্যিকার অর্থ বের করতে ব্যর্থ হয়ে সহজভাবে সমাধান করার চেষ্টা করার নাম জ্ঞান নয়। নিজে নিজেই সহজতর পথ বেছে নেওয়া অনেকটা চিত্রকরের ছবি আঁকার মতো যে তার মনের মাধুরী মিশিয়ে তার ছবিকে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করে। ছবির কোনো অংশ আঁকতে সক্ষম না হলে সে অন্য কোনো ভাবে এটাকে আঁকার চেষ্টা করে থাকে। আমরা চাই যে, আসল ছবিটি আমার অংকনকৃত ছবির আলোকে দর্শকদের সামনে আনতে। আমরা কেন এরকম কাজের দিকে এগিয়ে যাই? কেননা আমাদের ব্যবহৃত সূত্র ও পদ্ধতিসমূহকে সমাধান করার জন্য পর্যাপ্ত গাণিতিক জ্ঞান আমাদের নেই। আমরা যে পথে সকল গাণিতিক ও বৈজ্ঞানিক সমস্যা সমাধান করার চেষ্টা করি সেটা হলো সীমাবদ্ধ একটি পথ। পাশ্চাত্যের যে প্রযুক্তি ও জ্ঞানকে ব্যবহার করে রকেট-এর মাধ্যমে চাঁদে যাচ্ছে, এটাকে আপনারা জ্ঞানের সর্বোচ্চ চূড়া হিসাবে ধরবেন না। পাশ্চাত্যের জ্ঞান ও বিজ্ঞান আজ এমন একটি অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে যে, এখান থেকে তারা আর খুব বেশিদূর এগুতে পারবে না।

আমার এই সকল উদাহরণ-এর মূল উদ্দেশ্য হলো পাশ্চাত্যের অসারতা প্রমাণ করা। যারা নিজেদের বড়ত্বকে প্রকাশ করে মুসলিমদেরকে খাটো করে। কিন্তু সত্যিকার অর্থে তারাই মুসলিমদের কাছে চিরঋণী। যদিও বা তারা নিজেদেরকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ধারক ও বাহক মনে করে পেছন থেকে বলে যে 'মুসলিমরা নীচু, তারা কিছু জানে না।' সত্যিকার অর্থে তারাই জানে না যে, তারা কী করছে। এটা তাদের জন্য খুবই দুর্ভাগ্যজনক। তাদের এই অহংকার তাদের জন্য এমন একটা পথ যেখান থেকে তারা বের হতে পারবে না। এর ফলাফল কি হবে তাহলে? বন্ধ পথের সন্ধান দেওয়ার জন্য মুসলিমরা জ্ঞান বিজ্ঞানের ব্যাপারে কি মতামত পোষণ করে সেটাকে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

মুসলিমগণ এই সূত্রাবলি ও হিসাব নিকাশের পদ্ধতিকে কিভাবে দেখে থাকে? এই প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে আমাদেরকে জানতে হবে যে, পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানীদের দ্বারা ব্যবহৃত

www.pathagar.org

অত্যাশ্চর্যজনক সূত্রাবলি কাদের দ্বারা আবিস্কৃত। প্রথমেই এটা আমাদের অনুসন্ধান করা উচিত। যদি পাশ্চাত্যের কোনো বিজ্ঞানী বলে যে, সে সকল বিষয়ে জ্ঞান রাখে তাহলে আমাদেরকে বুঝতে হবে যে তার জ্ঞানের স্বল্পতা আছে। আমরা সকলেই জানি যে, পৃথিবীর সকল মানুষের জ্ঞানকে যদি একত্রিত করা হয়, তাহলেও মহান আল্লাহ তায়ালার যে জ্ঞান তার সাথে তুলনা করলে সাগরের এক বিন্দু পানির সমানও হবে না। এই জন্য সামান্য জ্ঞানের অধিকারী মানুষের অহমিকা করা কখনো শোভা পায় না।

যদি পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানীগণ মহান রবের প্রতি কৃতজ্ঞ হত এবং তার জ্ঞানের বিশালতা সম্পর্কে জানত তাহলে তারা এতো অহমিকায় মত্ত হত না। সে তার নাফরমানির বদলে আল্লাহ তায়ালার কাছে আরও জ্ঞানের প্রার্থনা করত। আমরা যদি সকল জ্ঞান বিজ্ঞানকে একত্রিত করে হিসাব করা শুরু করি যে, পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত যতো জ্ঞান এসেছে এগুলো কোথা থেকে এসেছে এগুলোর মালিক কে? এ জ্ঞান কিভাবে কোথা থেকে আসল? এটাকে অনুসন্ধান করা একান্ত প্রয়োজন। আমরা একথা জানি যে, আজকের পৃথিবীতে যতো জ্ঞান রয়েছে এগুলো মানুষ ক্রমে ক্রমে উন্নতি করেছে।

আজকে আমরা শুধুমাত্র ৫০০০ বছরের জ্ঞান বিজ্ঞান সম্পর্কে জানি। কিন্তু ৫ হাজার বছর পূর্বেও মানুষের অস্তিত্ব ছিলো ৫ হাজার বছর পূর্বে লেখা আবিস্কৃত হয়েছিল বলে ৫০০০ বছরের জ্ঞান বিজ্ঞানের ডকুমেন্ট আমাদের কাছে রয়েছে কিন্তু লেখা আবিস্কৃত হওয়ার পূর্বে মানুষ কি জানত তাদের জ্ঞান কতটুকু ছিলো তা আমাদের হাতে নেই। এইজন্যে আমরা ৫০০০ বছর আগে ফিরে যাব এবং দেখব যে, এই ৫০০০ বছরে জ্ঞান বিজ্ঞান কিভাবে উন্নতি লাভ করেছে।

আমরা যদি ধরে নেই যে, প্রথম মানুষ জ্ঞান বিজ্ঞান সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলো। তাহলে মানুষ কিভাবে জ্ঞান ও বিজ্ঞানকে দিন দিন উন্নতির দিকে ধাবিত করেছে? ৫ হাজার বছর আগের একজন মানুষ যে-কিনা প্রস্তর যুগে বসবাস করত তার আবাস ছিলো পাহাড়ের গুহা। সে জানত না আগুন কী? আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আস্তে আস্তে মানুষকে মেধা ও যোগ্যতা দান করেছেন এবং তার নিয়ামত দান করেছেন। মানুষ সকল সৃষ্টি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক সৃষ্টি। অন্যান্য প্রাণী যেমন, বাঘ, সিংহ ও বানর এদেরকে আল্লাহ তায়ালা কিছু সক্ষমতা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন কিন্তু মানুষের মতো তাদেরকে জ্ঞান বুদ্ধি দান করা হয়নি। উদাহরণস্বরূপ একজন মানুষ যখন একটি পশুকে ঘায়েল করতে চায় পশুটিকে কিভাবে ঘায়েল করতে হবে এটা সে জানে।

কিন্তু পশু এই পদ্ধতিটি জানে না বা রপ্ত করতে পারে না। মহান আল্লাহ মানুষকে বুদ্ধি দান করেছেন, বিভিন্ন নিয়ামতে তার চলার পথ সহজ করে দিয়েছেন। তার নিয়ামতের কারণেই মানুষ বিভিন্ন পথের সন্ধান পেয়েছে, নতুন নতুন উদ্ভাবনী শক্তি আবিষ্কার করছে। মানব সভ্যতার ইতিহাসে আগুন আবিষ্কারকে সবচেয়ে বড় আবিষ্কার হিসাবে ধরা হয়। যে সকল মানুষ আগুন আবিষ্কার করেছে তারা হয়ত আগ্নেয়গিরির লাভার উদগীরণ দেখে বিভিন্ন পাতা ও কাষ্ঠ খন্ডকে একত্রিত করে আগুন জ্বালাতে শিখেছে। কিন্তু

www.pathagar.org

প্রাচীনকালে মানুষ কিভাবে এটার সম্প্রসারণ ঘটিয়েছে সেটা আমরা জানি না। কিন্তু আমরা এটা ধারণা করতে পারি যে এই পদ্ধতিটি আস্তে আস্তে উন্নতি লাভ করেছে। এর পর অন্যান্য জ্ঞানগুলোও মানুষ আস্তে আস্তে রপ্ত করেছে। শিখে শিখেই মানুষ তার আজকের অবস্থানে পদার্পণ করেছে। সর্বপ্রথম মানুষ এবং প্রথম যুগের মানুষের জ্ঞান সম্পর্কে বর্ণনা আমি করতে পারব না কেননা, হজরত আদম আ.-এর জ্ঞান কতটুকু ছিলো সেটা আমরা জানি না। শুধুমাত্র প্রস্তর যুগের মানুষের জ্ঞান কতটুকু ছিলো সেটাই আমরা জানি।

সবচেয়ে আশ্চর্যজনক ব্যাপার হলো ৫০০০ বছরের মানব সভ্যতার ইতিহাসে আমাদের সময় পর্যন্ত মানুষের জ্ঞান কিভাবে মানুষ রপ্ত করতে পেরেছে? এর সবচেয়ে সহজ-সরল ব্যাখ্যা হলো মানুষের আজকের এই জ্ঞান বিভিন্ন তারিখ ও সালের সাথে রপ্ত করেছে এই ভাবে তারা আজকের জ্ঞান বিজ্ঞান পর্যন্ত আসতে পেরেছে।

কিন্তু জ্ঞান বিজ্ঞানের ইতিহাস আমাদেরকে বলে ভিন্ন কথা, ইতিহাস থেকে আমরা শিখতে পারি যে, মানুষের জ্ঞান এইভাবে কোনো নিয়মিত প্রক্রিয়ায় (regular process) আসেনি। তাহলে কিভাবে উন্নতি লাভ করেছে? আমরা যখন অনুসন্ধান করি তখন দেখতে পাই যে প্রাথমিক দিকে মানুষ আস্তে আস্তে/ক্রমধারায় (gradually) জ্ঞান লাভ করতে পেরেছে এই পদ্ধতিটি ছিলো একটি সময় পর্যন্ত কিন্তু এর পর এটা পর্যায়ক্রমে উন্নীত হয়েছে। এর পর এটা আবার মন্থর হয়ে পড়েছিল, কিন্তু জ্ঞান-বিজ্ঞানের চরম উন্নতি ও অগ্রগতি হয়েছিল কোন সময়ে? জ্ঞান ও বিজ্ঞানের এই চরম উন্নতি ঘটেছিল মূলত ইসলামের সোনালি যুগ ৭ম শতাব্দীতে আর এই ধারা অব্যাহত ছিলো ১৪ থেকে ১৫ শতাব্দী পর্যন্ত।

ইতিহাস সাক্ষী জ্ঞান বিজ্ঞান এইভাবে তার উন্নতির উচ্চ শিখরে পৌঁছেছিল। ৭ম শতাব্দী থেকে জ্ঞান বিজ্ঞানের এই বিপ্লব মূলত হয়েছিল মুসলিমদের হাতে কিন্তু পরবর্তীতে ইউরোপিয়ানরা মুসলিমদের কাছ থেকে ১৫শ শতাব্দী থেকে দখল করা শুরু করে। এটা শুরু হয় ইউরোপের রেনেসাঁর মাধ্যমে এবং ক্রুসেডের পর এটা পুরোপুরি তাদের হাতে চলে যায় এবং তারা এর উন্নতিতে ভূমিকা রাখতে শুরু করে। প্রকৃত পক্ষে ইসলামের সোনালি যুগ থেকে রেনেসাঁ (৭-১৪) শতাব্দী পর্যন্ত ৭ শত বছর জ্ঞান বিজ্ঞানের সকল শাখায় একচ্ছত্রভাবে মুসলিমদের বিচরণ ক্ষেত্র ছিলো।

তারাই মূলত এই ৭শত বছর জ্ঞান বিজ্ঞানের লালন করত। গবেষণায় এটা প্রমাণিত যে, আজকে মানুষের কাছে যে জ্ঞান রয়েছে এর ৬০-৭০% ই এসেছে মুসলিমদের কাছ থেকে। মুসলিম মণীষীরাই জ্ঞানের উন্নতি অগ্রগতিতে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রেখেছিল। এটা দ্বারা কী বুঝায়? যারা আমাদের সাথে অহমিকা প্রদর্শন করে আমাদের মুসলিম জাতিকে হীন ও নীচু দৃষ্টিতে দেখে তারা জানে না যে তাদের জ্ঞানের ৭০ ভাগেরও বেশি এসেছে মুসলিমদের কাছ থেকে। তাদের এমন অহমিকার মূল কারণ হলো জ্ঞান বিজ্ঞানের ইতিহাস সম্পর্কে অজ্ঞতা। সত্যিকার অর্থেই কি এমন? অর্থাৎ মুসলিম

www.pathagar.org

শাসনামলে জ্ঞান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে কি এতটাই উন্নতি হয়েছিল? আমি এই কথার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে যাওয়ার পূর্বে যে দু'টি সময়ে জ্ঞান বিজ্ঞান উৎকর্ষ লাভ করেছিল সে সম্পর্কে তাৎপর্যপূর্ণ ৩টি বিষয় বলতে চাই। দেখুন ইসলামের সোনালি যুগে মুসলিমদের দ্বারা জ্ঞান বিজ্ঞানে যে উৎকর্ষতা সাধিত হয়েছিল সে জ্ঞান মানবকল্যাণে কতটুকু ভূমিকা রেখেছিল অপর পক্ষে ইউরোপীয় রেনেসাঁর সময়ে মুসলিমদের কাছ থেকে যে জ্ঞান তারা আহরণ করেছিল সেটা কিভাবে হয়েছিল। যারা আমাদের বিরুদ্ধে কথা বলে। তারা বলে থাকে যে, শুধুমাত্র পাশ্চাত্যেই জ্ঞান বিজ্ঞানের উৎকর্ষতা সাধিত হয়েছে। তোমরা এই সকল ব্যাপারে অজ্ঞতার অন্ধকারে রয়েছ। এই কথা বলেই তারা থেমে থাকেনি। পাশ্চাত্যে যারা ইসলামবিদ্বেষী, ইসলামকে খাটো করে প্রকাশ করাই যাদের কাজ তারা মানুষের মাঝে ইসলাম সম্পর্কে ভুল ও ভ্রান্ত ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করেছে এবং তারা কি বলে জানেন?

পাশ্চাত্যবাদীরা তাদের কথাগুলোকে বারবার পুনরাবৃত্তি করে থাকে এই বলে "আপনারা জ্ঞান ও বিজ্ঞানের যতটুকু উৎকর্ষতা সাধন করেছেন মুসলিমরা তা করতে পারেনি। তারা প্রাচীন গ্রিক, প্রাচীন ভারত ও প্রাচীন মিশরের জ্ঞানকে নেওয়ার পর সেখান থেকে কিছুটা শিক্ষা গ্রহণ করে এবং মৌলিক মানবীয় যোগ্যতার বলে সেখানে কিছু উন্নতি করার চেষ্টা করে কিন্তু পরবর্তীতে জ্ঞানের আসল ধারক বাহক ইউরোপিয়ানদের কাছে এটা সমর্পণ করে দেয়।" তাদের এই প্রচার সম্পূর্ণ ভাবেই মিথ্যা। সত্যিকার অর্থে মুসলিমগণ প্রাচীন গ্রিক, ভারতীয় ও মিশরীয়দের কাছ থেকে জ্ঞান বিজ্ঞান নিয়েছিল অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষার পর কিন্তু এই জ্ঞান নেওয়ার ক্ষেত্রে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিলো।

১. এই তথ্যউপাত্ত কার কোন্ বই থেকে নেওয়া হয়েছে সেটা উল্লেখ করত এবং বলত যে, "(Batlamyus) বাতলামইউসের এই বইটি পড়েছি সেখান থেকে এই তথ্য পেয়েছি। আমরা অকলিড (Oklid) এর এই এটি বইটি থেকে একথা জানতে পেরেছি, আমরা পিথাগোরাসের এই বই থেকে এ পেয়েছি" এইভাবে সর্বদাই তথ্যসূত্র দেওয়া থাকত।

২. ইসলামী পণ্ডিতগণ প্রাচীন সভ্যতার সাথে সম্পৃক্ত বইগুলোকে পড়ে সেখান থেকে তথ্য উপাত্ত নেওয়ার সময় মুখস্থ করার মাধ্যমে গ্রহণ করেন নাই। তারা এটাকে সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করার আগ পর্যন্ত গ্রহণ করেননি।

৩. ইসলামী পণ্ডিতগণ যখন প্রাচীন গ্রিক, মিশরীয় ও ভারতীয়দের কাছ থেকে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করছিলেন তখন তারা নিজেরাই জ্ঞান বিজ্ঞানে অন্যদের তুলনায় উচ্চে অবস্থান করছিলেন এবং গ্রিক, মিশর ও ভারতীয় জ্ঞান বিজ্ঞান ছিলো অনেক নিম্নে। তারা জ্ঞান বিজ্ঞানকে পরিপূর্ণ করার মানসে উন্নত-অনুন্নত ভেদাভেদ না করে সকলের কাছ থেকেই জ্ঞান অর্জনে ব্রত ছিলেন। এটার দ্বারা কী বুঝায়?

www.pathagar.org

এখন আমি আপনাদেরকে এই সম্পর্কে বলতে চাই। ৩য় স্তরে আমরা দেখতে পাই যে, মুসলিমগণ অন্যদের কাছ থেকে জ্ঞান আনয়নের ক্ষেত্রে সকলের জ্ঞানকেই গ্রহণ করেছেন। কিন্তু অপরপক্ষে ক্রুসেড ছড়িয়ে যাওয়ার পর ইউরোপীয়গণ যখন মুসলিমের সাথে উঠাবসা শুরু করে তখনই মূলত তারা মুসলিমদের কাছ থেকে জ্ঞান লাভ করতে থাকে। কিন্তু এক্ষেত্রে তিনটি বিষয় বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

ক. ইউরোপিয়গণ এই তথ্য উপাত্ত জ্ঞান কোথা থেকে সংগ্রহ করেছে এর উৎস সম্পর্কে কখনো বলেনি। মুসলিমদের লেখা বইগুলো পড়েছে কিন্তু কার কোন পুস্তক থেকে তথ্য নেওয়া হয়েছে এটা উল্লেখ করেন নাই। অন্যান্য ইউরোপিয়গণ যখন এই সকল বই-পুস্তক পড়েছে তখন তারা ভেবেছে এগুলো ইউরোপিয়ান লেখকদের লেখা পুস্তক। এইভাবে তথ্যবিভ্রাট ছড়িয়ে পড়েছে পুরো ইউরোপ জুড়ে। আমাদের বই পুস্তকগুলোতেও আজ ইউরোপীয় বিজ্ঞানীদের তথ্য উপাত্তকেই পড়ানো হয়। আমরাও মনে করি যে, বিজ্ঞানে ব্যবহৃত সূত্রগুলো তারাই আবিষ্কার করেছে। কিন্তু বাস্তবিক অর্থে সত্য কথা হলো তারা এগুলো মুসলিমদের লেখা বই থেকেই পড়ে নিজেদের নামে চালিয়ে দিয়েছে। সত্যিই কি তাই? আমি এগুলোকে প্রমাণ করার জন্য আপনাদের সামনে উদাহরণ পেশ করব।

খ. ইউরোপিয়ানরা মুসলিমদের কাছ থেকে জ্ঞান নেওয়ার সময় তারা এটাকে না বুঝেই গ্রহণ করেছিল। আজকের এতো উন্নত চোখধাঁধানো ইউরোপ কিভাবে এগুলো না বুঝে গ্রহণ করেছে? এটা হয় কিভাবে? হয়ত এই প্রশ্ন আপনারা আমাকে করবেন। আমি এখন আপনাদেরকে উদাহরণ দিব। আমরা দেখতে পাব তাদের না বুঝা বিষয়গুলো।

গ. ইউরোপিয়গণ যখন এই জ্ঞান বিজ্ঞানগুলো মুসলিমদের কাছ থেকে গ্রহণ করেছিল তখন তাদের যোগ্যতা এই জ্ঞানগুলো গ্রহণ করার ক্ষেত্রে উপযুক্ত ছিলো না। অর্থাৎ ইউরোপিয়ানরা মুসলিমদের কাছ থেকে জ্ঞান আহরণের ক্ষেত্রে উপর থেকে নিচে এই নীতিতে জ্ঞান আহরণ করেছে। মুসলিমরা ছিলো উপরে আর ইউরোপিয়ানরা ছিলো নিচে। কোন দৃষ্টিকোণ থেকে মুসলিমরা উন্নত ছিলো? ইউরোপিয়ানরা যখন এই জ্ঞানগুলো নিচ্ছিলো তাদের ভাষা এই জ্ঞান গ্রহণ করার ক্ষেত্রে উপযুক্ত ছিলো না। মুসলিমদের কিতাবগুলো ও কিতাবের পূর্ণ অর্থ গ্রহণে সক্ষম ছিলো না।

১৪ শতাব্দীতে তারা যে সকল সূত্র ও তথ্য উপাত্ত অনুবাদ করেছিল সেগুলো তারা ১৮ শতাব্দীতে এসে বুঝতে শুরু করেছিল। অর্থাৎ ৪ শতাব্দী পর তারা এটাকে অনুধাবন করতে শুরু করেছিল। কিছু কিছু জ্ঞান তার ৫ শতাব্দী পর তারা বুঝতে শুরু করেছিল।

সম্মানিত ভাইয়েরা, সংক্ষিপ্তভাবে বলতে গেলে, মুসলিমগণ অন্যদের নিকট থেকে জ্ঞান আহরণের সময় এটা কার কাছ থেকে কিভাবে গ্রহণ করছে সেটার তথ্য সূত্রকে উল্লেখ করত। এই সকল জ্ঞান যেমন ছিলো সেভাবেই গ্রহণ করেছিল, ভুলগুলোকে সংশোধন করে গ্রহণ করেছিল, বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে সেগুলোকে উপযোগী করে তুলেছিল।

www.pathagar.org

যে সকল জাতি থেকে জ্ঞান নিয়েছিল তাদের থেকে মুসলিমরা ছিলো অনেক উন্নত ও অগ্রগামী। কার কাছ থেকে কী এনেছিল সেটা উল্লেখ করেছিল। তারা এগুলোকে বুঝার জন্য শতাব্দীর পর শতাব্দী ব্যয় করেছিল।

আমরা এখানে এগুলো কোনো প্রকার দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছাড়াই তুলে ধরতে পারছি। কিন্তু আমাদের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব হলো এগুলোকে ইসলামের শত্রু ও পাশ্চাত্যবাদীদের সামনে তুলে ধরে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করা। আমরা যে ব্যাপারগুলো নিয়ে কথা বললাম এর সত্যতা বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরার দায়িত্ব আমাদের। এই দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সম্পৃক্ত কিছু উদাহরণ আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাই। আমি বলতে চাই যে, আজকে আমরা যেভাবে পাশ্চাত্যের জ্ঞান বলে অভিহিত করে থাকি, যেমন পদার্থ, রাসায়ন, গণিতশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা, ইতিহাস, ভূগোল এমনকি আজকের জ্ঞান বিজ্ঞানের সকল কিছুই মুসলিমদের উদ্ভাবিত। মুসলিমরাই এগুলোর সূচনা করেছে। অবশ্যই এটি অনেক বড় একটি দাবি কিন্তু আমি এই দাবিকে প্রমাণ করার জন্যে উপস্থিত।

দেখুন উদাহরণস্বরূপ আজকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো চাঁদে এবং মহাকাশে যাওয়া। মহাকাশ ও চাঁদে যাওয়ার যে বিষয় সেটি জ্যোতির্বিদ্যার সাথে সম্পৃক্ত একটি জ্ঞান এবং আমরা জানি যে, জ্যোতির্বিদ্যার জ্ঞান মূলত উদ্ভাবিত হয়েছিল মুসলিমদের মাধ্যমে। যে মুসলিম এই জ্ঞানের জনক কে তিনি? আমি আপনাদেরকে এগুলো থেকে শুধুমাত্র কয়েকটি বিষয়ের আলোচনা করব। ইসলামের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীদের মধ্যে অন্যতম হলেন আল বাত্তানী ইসমাইলি। তিনি হলেন অন্যতম শ্রেষ্ঠ একজন জ্যোতির্বিজ্ঞানী। আল-বাত্তানী কে? আপনারা কি জানেন কে তিনি? হয়ত আমাদের মধ্যে কেউ কেউ জেনে থাকবেন। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আমরা আমাদের বিজ্ঞানীদের সম্পর্কে জানি না, আমাদেরকে আমাদের প্রেরণার উৎস মুসলিম বিজ্ঞান সম্পর্কে শেখানো হয় না। আমাদের মধ্যে হয়ত অনেকেই বাতলামাইউস (Batlamyus) এর নাম জানেন। তাকে অনেকেই পতলেমে (Ptoleme) নামে চিনে। কেন? কেননা আমাদের বই পুস্তকে তাদের সম্পর্কে লেখা হয়, তাদেরকে নিয়ে আলোচনা করা হয়। কিন্তু আল-বাত্তানীর নাম পর্যন্ত উচ্চারণ করা হয় না। কেন? এর পেছনে মূল কারণ হলো আমাদের বই পুস্তকগুলোর অধিকাংশই পাশ্চাত্যের বই পুস্তকগুলো থেকে অনুবাদ করা হয়েছে। তথাপি বাতলামাইউস (Batlamyus) এর অবস্থান কোথায় আর আল-বাত্তানী কোথায়? বিজ্ঞানে এই ২জনের মধ্যে কার অবস্থান কত উপরে সেটা আপনাদের সামনে প্রকাশ করব। আল বাত্তানীর পূর্বে মিশরীয় বিজ্ঞানী বাতলামাইউস (Batlamyus) মহাকাশে সূর্যের প্রদক্ষিণ সম্পর্কে একটি ধারণা পেশ করেছিলেন সেটা হলো মহাকাশে সূর্য তার নিজস্ব জায়গায় ফিরে আসতে ২৬০ দিন লাগে অর্থাৎ বছরে ২৬০ দিন।

কিন্তু আল বাত্তানী তার এই কথাকে ভুল প্রমাণ করে বলেন যে সূর্য তার একই অবস্থানে

www.pathagar.org

ফিরে আসতে ৩৬৫ দিন ৫ ঘন্টা ৪৬ মিনিট ২২ সেকেন্ড লাগে। অর্থাৎ এক বছর মানে হল ৩৬৫ দিন ৫ ঘন্টা ৪৬ মিনিট ২২ সেকেন্ড। এখন পাশ্চাত্য কি আমাদেরকে এটা বলতে পারবে যে, আল বাত্তানী এবং বাতলামাইউস এর গবেষণার মাঝে খুব সামান্য পার্থক্য রয়েছে। আল-বাত্তানী যে হিসাব আমাদের সামনে পেশ করেছেন আজকের সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে যে হিসাব বের করা হয়েছে তার সাথে মাত্র ২ মিনিট ২৪ সেকেন্ড এর পার্থক্য রয়েছে। আল বাত্তানী এতো বছর পূর্বে আমাদের সামনে এতো নিখুঁত একটি হিসাব করে দেখিয়েছেন। আচ্ছা যে ব্যক্তি হিসাব করে দেখিয়েছেন যে ২৬০ দিনে এক বছর আর যিনি বলেছেন যে ৩৬৫ দিন ৫ ঘন্টা ৪৬ মিনিট ২২ সেকেন্ড- ২ জনের অবস্থান কি একই? আমরা এরকম পার্থক্য অন্যান্য ক্ষেত্রেও দেখতে পাই। কেন? কারণ হলো মুসলিমগণ জ্ঞান বিজ্ঞানে উৎকর্ষ সাধন করার পর (Batlamyus) বাতলামাইউস এর মতো বিজ্ঞানেও ইতিহাসের পেছনে পড়ে থাকবেন।

প্রাচীন মিশরীয়রা ভূমধ্যসাগরের দৈর্ঘ্য অর্থাৎ মেরসিন থেকে ইসকেনদেরিয়া-এর দূরত্ব তারা মেপেছিল আজকের দূরত্ব থেকে ২০ ভাগের ১ ভাগ অর্থাৎ আনকারা থেকে কনিয়ার দূরত্ব ২৬০ কিলোমিটার কিন্তু তারা ভাবত যে ১৩ কিলোমিটার কিন্তু যখন মুসলিমরা ক্ষমতা পায় তখন তারা ভূমধ্যসাগরের সঠিক দৈর্ঘ্য বের করতে সক্ষম হয়। কিভাবে তারা পরিমাপ করেছিল? আব্বাসীয় খলিফা মামুন নির্দেশ প্রদান করেন যে, "ভূমধ্যসাগরের তীরে অবস্থিত মুসলিম জনগণের ভূমির তফসিলভুক্ত জরিপ ও সেখানে অবস্থিত মুসলিম জনগণের অধিকার নিরূপণ করতে চাই। ভূমধ্যসাগরের তীরে অবস্থানরত মুসলিম জনগণ ও তীরের দৈর্ঘ্য সঠিকভাবে নির্ণয় করে আমার কাছে নিয়ে আসবে"। এই কাজটি সঠিকভাবে সম্পন্ন করার জন্য তিনি একদল ভূগোল বিজ্ঞানীকে দায়িত্ব প্রদান করেন। মুসলিম বিজ্ঞানীগণ সেই সময়ের সকল প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে ভূমধ্যসাগরের প্রস্থ মাপার জন্য একটি পথ অনুসরণ করেন : তারা ভূমধ্যসাগরের তীরে গড়ে উঠা একটি শহর থেকে পরিমাপ করার কাজ শুরু করে। তারা উঁচু পাহাড়ের চূড়ায় উঠে সেই চূড়া থেকে যতটকু দেখতে পারে ততটুকু পর্যন্ত তারা দেখে। এরপর তারা সাগরের উচ্চতায় পাহাড়ের চূড়ার উচ্চতাকে পরিমাপ করে। সূর্য ডোবার সময় পাহাড়ের চূড়া থেকে সেই সময়ের যন্ত্রপাতি দিয়ে এর মধ্যকার কোণকে পরিমাপ করে। যদি আরও সহজভাবে একটি উদাহরণ পেশ করি তাহলে যেমন ধরুন কনিয়াতে একটি পাহাড়ের চূড়ায় উঠলাম, দেখি কি কুলের ওখানে সূর্য অস্ত হচ্ছে। সূর্য সেখানে কত ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে ডুবছে সেটার একটা পরিমাপ করি। যে পাহাড়ের চূড়ায় উঠেছি তার উচ্চতা মেপে নেই।

পাহাড়ের উচ্চতা মাপার পরও সূর্য কত ডিগ্রি কোণে ডুবলো সেটা জানার পর পাহাড় থেকে কুলের (একটি জায়গার নাম) দূরত্ব জেনে নেই। অর্থাৎ কুল থেকে কনিয়ার দূরত্ব হিসাব করছি। কিভাবে? হিসাব করি? শুধুমাত্র এটাকে হিসাব করার জন্য আজকে যে আমরা (sine) সাইন, (cosine) কোসাইন, (tangent) টেনজেন্ট ব্যবহার করি এই

www.pathagar.org

ত্রিকোণমিতির ধারণা আবিষ্কার করে হিসাব করা হলো। ত্রিকোণমিতির এই ধারণা সর্বপ্রথম খলিফা মামুনের সময়ে মুসলিম বিজ্ঞানীগণ আবিষ্কার করেন। তারা এই দূরত্ব হিসাব করার সময় বিপরীত কোণের সাইন (sine) ও কোসাইন (cosine) হিসাব করে এবং এই হিসাবের দ্বারা তারা দূরত্ব পরিমাপ করতে সক্ষম হয়। আমরা সাইন (sine) সম্পর্কে পরবর্তীতে আলোচনা করব।

শুধুমাত্র ভূমধ্যসাগরের প্রস্থ কিভাবে মেপেছিল সে সম্পর্কে বলতে চাই। এখান থেকে যাওয়ার কুলুর পাহাড়ের চূড়ায় উঠার পর সেখান থেকে আনকারার দিকে তাকায়। এরপর দুই পাহাড়ের মাঝখানের দূরত্ব মেপে এইভাবে পাহাড়ের চূড়ায় উঠে উঠে শহরের মাঝখানের সকল দূরত্বকে মেপে মেপে ভূমধ্যসাগরের সম্পূর্ণ দৈর্ঘ্যকে পরিমাপ করে। প্রাচীন মিসরীয়রা ভূমধ্যসাগরের দৈর্ঘ্য আজকের দৈর্ঘ্য থেকে ২০ ভাগের ১ ভাগ ভাবত। কিন্তু মুসলিমরা সকল অসম্ভাবনাকে সম্ভব করে সত্যিকারের দূরত্ব মাপতে পেরেছিল।

এখন আসি সাইন (sine) এর কথায়। যে সকল ভাইয়েরা তুলনামূলকভাবে আগে ত্রিকোণমিতি পড়েছেন তারা জানেন যে, আগে ত্রিকোণমিতি পড়ার সময় sine, cosine এ সকল শব্দের জায়গায় zeyp শব্দ ব্যবহৃত হত। zeyp শব্দটি একটি আরবি শব্দ। খলিফা মামুনের সময় সর্বপ্রথম মুসলিম বিজ্ঞানীগণ দূরত্ব পরিমাপ করার ক্ষেত্রে এই শব্দগুলোর ব্যবহার করেছিলেন। সে সময়ের মানুষগণ দৈর্ঘ্য পরিমাপ করার জন্য দৈর্ঘ্যকে জেপ (zeyp) এর সাথে তুলনা করেছিলেন। এই জেপ (zeyp) আমাদের তারকিশ ভাষায় ব্যবহৃত জেপ (zeyp) নয়। হিসাব করার সময় বই পুস্তকে "zeyp down, zeyp above" এরকম অনেক হিসাব করা হতো। ক্রুসেড এরপর ইউরোপিয়ানরা এই সকল বই পুস্তক পেতে শুরু করে এবং দেখে এরা ভূমধ্যসাগরের প্রস্থ অসাধারণ সঠিকভাবে পরিমাপ করেছে। গাণিতিক হিসাব গুলোতে zeyp এর মতো শব্দ থাকায় এ হিসাব তারা ধরতে ও বুঝতে পারেনি।

এ হিসাবগুলোকে বুঝার জন্য অভিধানের সাহায্য নিয়েছে, আরবিতে জেপ (zeyp) শব্দের ল্যাটিন হলো সাইন (sine) তারা এই ল্যাটিন শব্দকে ব্যবহার করেছে। ইউরোপিয়ানরা এটাকে sine (সাইন) বলার কারণে আমরাও যেহেতু ইউরোপ থেকে সবকিছু আমদানি করছি, সেহেতু আমাদের উদ্ভাবিত শব্দকে তারা না বুঝার কারণে তারা তাদের বুঝার স্বার্থে যে শব্দ ব্যবহার করেছে আমরাও আমাদের পাঠ্য পুস্তকে তাদের অভিহিত করা নামে আমরাও পড়ছি ও পড়াচ্ছি। এই জন্যই sine, cosine এই শব্দগুলি ব্যবহার করছি। শুধু কি তাই এগুলো যারা পড়ছেন পড়াচ্ছেন তারা সবাই মুসলিম। সম্পদের আসল মালিক হলো মুসলিম, ইউরোপিয়ানরা আমাদের কাছ থেকে না বুঝে নিয়েছিল আমরাও না বুঝে ইউরোপিয়ানদের নিকট থেকে আনছি।

মুসলিমদের ইতিহাস এ রকম আবিষ্কারে পরিপূর্ণ। শুধু এগুলোই নয়, মুসলিমরা আজকের ভূগোলের যে পরিমাপ এটারও আবিষ্কারক। খলিফা মামুনের সময়ে হারবান

www.pathagar.org

এলাকা আমাদের তুরস্ক থেকে ইরাক এর বিভিন্ন শহর পর্যন্ত দূরত্বের পরিমাপ করেছিলেন। আজকে আমরা জানি যে, ভূমধ্যসাগরের কেন্দ্র থেকে এর দূরত্ব ১১১,০০০ কিলোমিটার। সেটা খলিফা মামুনের সময়েই মুসলিমরা পরিমাপ করেছিল। আর তারা যে পরিমাপ করেছিল সেটাও ছিলো ১১১,০০০ কিলোমিটার।

এখানেই শেষ নয়, মুসলিমরা সাইনাস টেবিল (sinus table)ও আবিষ্কার করেছিল। এই sinus table (সাইনাস টেবিল) আজকে আমরা ব্যবহার করে থাকি। এমনকি এগুলো বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছিল। আর এগুলো ছাপা হয়েছিল ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানিসহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে। আর আমরা খুবই হীনমন্যভাবে ধারণা করি যে, এ সকল পুস্তকের সকল হিসাব নিকাশ ও সূত্রাবলি ইউরোপিয়ানদের আবিষ্কার। অথচ সর্বপ্রথম ত্রিকোণমিতি টেবিল সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেছিল মুসলিমগণ। গিয়াসউদ্দিন জামশেদ তিনি খোরাসানের বাসিন্দা ছিলেন। তিনিও হলেন একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী। তিনি তার গ্রন্থ রিসালাতুল-মুহিতিয়েতে সর্বপ্রথম (sinus) সাইনাস এর হিসাব নিয়ে বিশদ আলোচনা করেন।

এখন চলুন পুনরায় আমরা পাশ্চাত্যের ইউরোপীয় মদদপুষ্টদের জিজ্ঞাসা করি, তোমরা যে বল মুসলিমরা গ্রিক ও মিসরীয়দের থেকে জ্ঞান বিজ্ঞান নিয়েছে। মিসরীয়দের মাঝে সাইনাস (sinus) এর ধারণা কোথায়? কোথায় তাদের মাঝে ত্রিকোণমিতির ধারণা? মিসরীয়দের মাঝে এসকল কিছুর বিন্দুমাত্রও ধারণা পাওয়া যায় না। কিন্তু দেখুন গিয়াসউদ্দিন জামশেদ কিভাবে (sinus) এর ধারণাকে বিশ্লেষণ করেছেন। D, 017 452 404 437 238 371. তিনি সাইন এক ডিগ্রি এর ধারণাকে এমনভাবে তুলে ধরেছেন যে, কমার পরে ১৬টি সংখ্যাকে তিনি সাইন (sin) এক ডিগ্রিতে গণনা করতে পেরেছেন। এই হিসাব যখন আজকে আমরা ইলেকট্রনিক ক্যালকুলেটরে করি তখন একই ফলাফল আমরা পেয়ে থাকি। গিয়াসউদ্দিন জামশেদ ত্রিকোণমিতির এই টেবিলকে/পরিমাপকে এ পদ্ধতিতে উদ্ভাবন করেছেন।

কিভাবে তিনি এটা করেছেন? তারা কিভাবে একাজ এ হিসাব নিকাশগুলো করেছেন এই চিন্তা যখন করি তখন আমরা অবাক হয়ে যাই। আমরা যখন তাদের জ্ঞান গরিমার এই উপমা দেখতে পাই তখন তাদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হওয়া ছাড়া অন্য কোনো উপায়ান্তর দেখিনা। একইভাবে আমরা ইউরোপিয়ানদেরকে যদি জিজ্ঞাসা করি যে, পাই (π) এর সংখ্যার ধারণার আবিষ্কারক কে? তারা নিশ্চিত করেই এটা বলবে যে এটা প্রাচীন গ্রিকদের আবিষ্কার। না, পাই (π) এর সংখ্যার আবিষ্কারক ও এর সর্বপ্রথম ধারণা দান করেন মুসলিমগণ। আর গিয়াসউদ্দিন জামশেদ এর রচিত বই রিসালাতুল মুহিতিয়া থেকে এর সম্পর্কে আপনাদের জানাতে চাই। গিয়াসউদ্দিন জামশেদ পাই (π) এর মান হিসাবে এই সংখ্যাগুলো উদ্ভাবন করেন: 3.141592635589743 । অর্থাৎ পাই (π) এর মান দশমিকের পরে ১৫টি সংখ্যার মাধ্যমে সঠিকভাবে আবিষ্কার করেছেন। আজকে আমরা যখন ইলেকট্রনিক ক্যালকুলেটর দিয়ে হিসাব করি আমরা এই সংখ্যার কোনো

www.pathagar.org

ব্যতিক্রম পাই না। কেননা ইসলামের সোনালি যুগে সকল জ্ঞান বিজ্ঞান মুসলিমদের হাতে উন্নতি লাভ করে এবং জ্ঞানের সত্যিকারের প্রসারণ শুরু হয়।

মুসলিমরা শুধুমাত্র জ্যোতির্বিদ্যা ও ত্রিকোণমিতিই আবিষ্কার করেনি। আজকের বীজগণিতের আবিষ্কারক হলেন মুসলিমগণ। আজকে আমাদের সামনে যে গণিত শাস্ত্র রয়েছে এর মূলনীতির উদ্ভাবক হলেন মুসলিম গণিত বিশারদগণ। দেখুন যারা আমাদের পাশে এসে গর্ব অহংকার করে বলে যে, আমরা চাঁদে যাই আমরা মহাকাশ পরিভ্রমণ করি। তাদেরকে যদি প্রশ্ন করি আপনারা হিসাব কিভাবে করেন? এই প্রশ্ন করার পর সে কিছু সংখ্যা লিখবে। আমরা যেরূপ জানি ১,২,৩,...৯ এরকম সংখ্যাগুলোই সে লিখবে। কিন্তু এ সংখ্যাগুলোরও আবিষ্কারক মুসলিমগণ, সংখ্যাগুলোর আকৃতি মুসলিমদের দেওয়া। ইউরোপিয়ানরা এই সংখ্যাগুলোর যে আকৃতি ব্যবহার করে সে আকৃতি ইউরোপ আমেরিকাতে অবস্থানরত মুসলিমদের ব্যবহৃত সংখ্যাগুলোর ন্যায়। আরও যদি সামনের দিকে যাই তাহলেও দেখতে পাই যে, যে মানুষগুলো আমাদেরকে তাদের চোখে নীচু ও হীন দেখতে অভ্যস্ত তাদের হিসাবের পদ্ধতিরও আবিষ্কারক মুসলিমগণ। এটা কিভাবে হয়েছিল? লক্ষ্য করুন পাশ্চাত্যের পন্ডিতগণ বলে থাকে যে মুসলিমগণ প্রাচীন গ্রিক ভারতীয় ও মিসরীয়দের কাছ থেকে জ্ঞান বিজ্ঞান গ্রহণ করেছেন। এটা কেমন জ্ঞান আহরণ গ্রিকদের সংখ্যার ধারণায় ৬০ এর অধিক কোনো সংখ্যা ছিলো না।

তাদের ভাষার যতগুলো হরফ ছিলো ততগুলোই ছিলো তাদের সংখ্যা অর্থাৎ হরফ শেষ হলে সংখ্যাও শেষ হতো। এরপর যখন মুসলিমদের হাতে জ্ঞান বিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধিত শুরু হয় তখন মুসলিমরা বলেন যে, আমাদের বিশাল বৈজ্ঞানিক গবেষণায় আপনাদের সংখ্যার সীমাবদ্ধতা যথেষ্ট নয়। অর্থাৎ আমরা নতুন সংখ্যা আবিষ্কার করব। কী আবিষ্কার করবেন? উত্তর হিসাবে বলেছিলেন যে, এমন একটি সংখ্যা আবিষ্কার করব যে সংখ্যা দিয়ে যতো বড় ইচ্ছা ততো বড় গাণিতিক সংখ্যার সমাধান করা সম্ভব হবে। উদাহরণস্বরূপ এক সংখ্যাটি লিখলাম। এটাকে যদি (১) এই গঠনে গঠন করি এবং এরপর যদি দুটি শূন্য (০০) বসাই তাহলে এটি হতে শতক, তিনটি শূন্য বসালে হবে (১০০০) হাজারে এভাবে যতো ইচ্ছা শূন্য বসানো সম্ভব। এ সকল সংখ্যার মাধ্যমে যতো ইচ্ছা গাণিতিক সংখ্যা লেখা সম্ভব। শুধু এখানেই শেষ নয়।

এই সংখ্যা আবিষ্কার করার পর আজকের গুণ, ভাগ, যোগ, বিয়োগ এর পদ্ধতিও আবিষ্কার করে মুসলিমরা। প্রাচীন গ্রিক ও মিসরীয়রা কিন্তু গুণ, ভাগ, যোগ, বিয়োগ এই পদ্ধতি সম্পর্কে অবগত ছিলো না। কেননা তাদের সংখ্যার পদ্ধতি এই পদ্ধতির জন্য উপযোগী ছিলো না। তারা যোগ বিয়োগ করার জন্য বিভিন্ন কাঠিকে ব্যবহার করত। মুসলিমগণ এগুলোকে বিশ্লেষণ করে দেখলেন যে এগুলো গণিতের জন্য উপযোগী নয়। তখন তা তারা নতুন সংখ্যার উদ্ভাবন করে এই পদ্ধতিকে চালু করে। দশক সংখ্যার এই পদ্ধতির আবিষ্কার নিঃসন্দেহে মানবজাতির জন্য একটি অনেক বড় খেদমত।

www.pathagar.org

মুসলিমরা যদি শুধুমাত্র বলে যে, 'তোমরা আমাদের উদ্ভাবিত সকল কিছুই ব্যবহার করতে পার শুধু আমাদের উদ্ভাবিত সংখ্যা ব্যবহার করবে না'এ কথা যদি বলা হয় তাহলে ইউরোপিয়ানরা তাদের উদ্ভাবন আর ধরে রাখতে পারবে না। এমনকি তারা নতুন আবিষ্কারের দিকেও এগোতে পারবে না। অথচ তারা আমাদের কাছে এসে গর্বে বুক ফুলিয়ে বলে যে ইসলাম হলো মধ্যযুগীয় একটি ধারণা। বর্তমানে এটি মানবসভ্যতা ও মানবকল্যাণের উপযোগী নয়। হ্যাঁ আমরা আমাদের মধ্যযুগীয় ধারণা নিয়েই সন্তুষ্ট, আপনারা আমাদের সকল সম্পদ ফিরত দিন, আমাদের মধ্যযুগের উদ্ভাবন আপনারা কেন ব্যবহার করছেন? আপনারা আমাদের উদ্ভাবন ব্যবহার করবেন না। আমরাও আপনাদের তথাকথিত নতুন উদ্ভাবন এগুলোও ব্যবহার করব না। আমরা আমাদের আবিষ্কার ও উদ্ভাবন দিয়ে আপনাদের চেয়েও উন্নত ও সোনালি সমাজ গড়ে তুলতে পারি যেমনিভাবে অতীতে পেরেছিলাম। গাণিতিক বিপ্লব ও বিজ্ঞানের সকল আবিষ্কার মুসলিমগণ গোটা মানবসভ্যতাকে উপহার হিসাবে পেশ করেছেন। কিন্তু আমরা নিজের অতীত ইতিহাস ভুলে অন্যকে অনুসরণ করছি।

মুসলিমদের আবিষ্কার এখানেই শেষ নয়। আল জেবরা বা বীজগণিতের আবিষ্কারকও মুসলিমগণ। "জেবির" অর্থাৎ বীজগণিত বলতে কী বুঝায়? জেবির শব্দটিও মুসলিম গণিতবিদ আল-জাবির এর নাম থেকে নেয়া হয়েছে। ইউরোপিয়ানরা এই নামটিকেও তাদের মুখে উচ্চারণ করে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতে পারেনি। তারা এই মহান ব্যক্তির নামকে লুকানোর লক্ষ্যে তার নামকে বিকৃত করে তাদের সকল পুস্তকে তার প্রণীত গণিতকে আল-জেবরা নামে অভিহিত করে। আজ ইউরোপের ইংল্যান্ড ও জার্মানির সকল স্কুলে গণিতের বইগুলোকে আল-জেবরা নামে অভিহিত করা হয়। আর আমরাও বীজগণিতকে আল-জেবরা নামে অভিহিত করে থাকি।

কে এই বীজগণিতের আবিষ্কারক? অবশ্যই মুসলিমগণ। কি করেছিল আল জাবির? জাবির যা করেছিলেন সেটা হলো প্রাচীন গ্রিক ও ভারতীয়দের গণিতকে তিনি ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন। কিন্তু তিনি পাশ্চাত্যের মতো তাদের থেকে নেওয়া জ্ঞানগুলোকে নিজের বলে দাবি করেননি। তা হলে তিনি কী করেছেন? তিনি যখন তাদের গণিতগুলোকে পর্যালোচনা করলেন তখন দেখতে পেলেন যে তারা ত্রিভুজ ও কিছু নকশার মাধ্যমে তাদের গাণিতিক সমস্যাকে সমাধান করে থাকেন। কারণ প্রাচীন গ্রিক ও মিসরীয়দের নিকট বীজগণিতের কোনো ধারণা ছিলো না। গাণিতিক সূত্রগুলোকে বর্ণমালার মাধ্যমে প্রকাশ করে আজকের এই বীজগণিতের ধারণার প্রবর্তন করেন।

যারা আজকে আমাদের সাথে দম্ভ করে কথা বলে তারা জানে না যে, বীজগণিতের উদ্ভাবকও মুসলিমগণ অর্থাৎ আল-জাবির। একটি সমীকরণের উভয় পক্ষে যদি যোগ করা হয়, গুণ করা হয় অথবা ভাগ করা হয় এই সমীকরণ এর কোনো পরিবর্তন হবে না। এটারও আবিষ্কারক হলেন আল জাবির। জাবির কী করেছেন? তিনি একই সাথে সমীকরণ দ্বিঘাত সমীকরণ ও ত্রিঘাত সমীকরণ এরও সমাধান দিয়েছেন তার রচিত

www.pathagar.org

বইয়ে। অপরপক্ষে বর্গ এর সাথে সম্পৃক্ত অনেক সমীকরণ ত্রিঘাত সমীকরণ দিয়ে সমাধান করা যায় না। কিন্তু ইসলামের সোনালি যুগের জ্ঞান বিজ্ঞান যখন মুসলিম উৎকর্ষের শীর্ষে তখন তাদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুসলিম গণিতবিদ আল জাবির ত্রিঘাত সমীকরণ এর মাধ্যমে কিভাবে সমাধান করা যায় সেটা তিনি দেখিয়েছেন এবং সে সাথে ঘনমূল (cube root) কে কিভাবে সম্পৃক্ত করা যায় সেটাও তিনি সর্বপ্রথম দেখিয়েছেন। এগুলো এতটাই উন্নতমানের ছিলো যে, তারা পুরাতন জ্ঞান বিজ্ঞানকে ঢেলে নতুন করে সাজিয়েছিলেন। আর এটা করেছিলেন দূরদর্শী মুসলিমগণ।

রাসূল সা. ইরশাদ করেন "তোমরা মুমিনের দূরদৃষ্টিকে ভয় কর, কেননা সে আল্লাহ তায়ালার নূরের মাধ্যমে দেখে থাকে " اتقوا فراسة المؤمن ، فإنه ينظر بنور الله " তাদের এই দৃষ্টি শুধুমাত্র আধ্যাত্মিক যে ছিলো সেটাও না। বরং এটা বাস্তবিক ও প্রকাশ্যেই ছিলো ইসলামের এই শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীদের জ্ঞান গবেষণার দিকে যখন আমরা তাকাই তখন আমাদের বিবেকের বুদ্ধি থমকে দাঁড়ায়। তারা এতো বড় বড় অসাধ্য কিভাবে সম্ভব করেছিল তার দিকে তাকিয়ে আমরা আশ্চর্য হয়ে যাই। সেই সময় থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত কোনো আল জাবির জ্ঞানের ক্ষেত্রে আর আসেনি। যারা নিজেদেরকে আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের ধারক বলে মনে করে তারা এরকম আল জাবির আমাদের সামনে পেশ করুন দেখি...

আমরা যে শূন্য (০) ব্যবহার করে থাকি এ ধারণাও মুসলিমরা উদ্ভাবন করেছেন। আজকের যে বীজগণিতের উচ্চ পর্যায়ে লিমিট (limit) পড়ানো হয় এটাও মুসলিমদের উদ্ভাবন। আমরা লগারিদম (logarithem) বলে যেটা জানি এটাও মুসলিমদের আবিষ্কার। লগারিদম এর সকল সূত্রাবলি সর্ব প্রথম আল-হারজেম (Al-Harzem) নামক মুসলিম বিজ্ঞানী আবিষ্কার করেছেন।

মুসলিমরা এই সকল গণিতকে উদ্ভাবন করেছেন। অপর দিকে ইতিহাস, পদার্থ, রসায়নেরও জনক মুসলিমগণ। আচ্ছা মুসলিমরা পদার্থ বিজ্ঞানে কী অবদান রেখেছিলেন? পশ্চাত্যরা যেভাবে বলে থাকে তোমরা সব প্রাচীন গ্রিক থেকে নিয়েছ। আমি একটা উপমার মাধ্যমে বুঝাতে চাই, আজকে পদার্থ বিজ্ঞানের জনক হলেন ইবনে হেইশাম (Ibni Heysam)। আমি যখন জিজ্ঞাসা করি তিনি কে ছিলেন, তাহলে কেউ তার সম্পর্কে বলতে পারবে না। অথচ তার রচিত বই আমরা অনেকেই স্কুল কলেজে পড়েছি। কিন্তু ইবনে হইশেম-এর নামসহ আমাদেরকে পড়ানো হয়নি। কিন্তু তিনি হলেন পদার্থবিজ্ঞানের জনক। অপরদিকে ইবনে হেইশাম (Ibni Heysam) আজকের পরমাণু (Atom) ও অণুর সর্বপ্রথম ধারণা প্রদান করেছিলেন। তিনি আলোর প্রতিসরণ এর সূত্র আবিষ্কার করেন। প্রাচীন গ্রিক বিজ্ঞানী অকলিত-এর মতে "যখন কোনো আলোকরশ্মি একটি ত্রিপার্শ্ব কাচ (prism) ভেদ করে তখন আলোক রশ্মির গতি কমে যায় এবং এর কমার হার প্রতিসরণের সমানুপাতিক প্রতিসরণ কোণের সমানুপাতিক। কিন্তু ইবনে হেইশেম (Heysem) বলেন এর কমার হার প্রতিসরণ কোণের সমানুপাতিক নয়। বরং

www.pathagar.org

এটি প্রতিসরণ কোণের সাইনের সমানুপাতিক।

রসায়ন বিজ্ঞানেরও জনক হলেন মুসলিম বিজ্ঞানীগণ। এর জনক হলেন জাবের ইবনে হাইয়্যান। তিনি সর্বপ্রথম (Fission of Atom) পরমাণু কে বিভক্ত করা যেতে পারে এ ধারণা প্রদান করেছিলেন। হিজরি ২য় শতাব্দীতে তিনি শ্রেষ্ঠ একজন বিজ্ঞানী হিসাবে আবির্ভূত হয়েছিলেন। রসায়ন (Chemestry) বিজ্ঞানে তিনি ছিলেন একজন উজ্জ্বল নক্ষত্র। পরমাণু তত্ত্ব তিনি প্রকাশ করেছিলেন। আজকে আমাদের পুস্তকে (Lavoisi) লাভোইস ও নিউটনের যে সূত্রগুলো পড়ানো হয় এগুলো তিনি বহু শতাব্দী আগে উদ্ভাবন করেছিলেন। ইউরোপিয়নদের আবিষ্কারের ১০০০ বছর পূর্বে তিনি এগুলো উদ্ভাবন করেছিলেন। জাবির ইবনে হাইয়্যান হলেন ৮ম শতাব্দীর বিজ্ঞানী। অন্যদিকে নিউটন ১৯ শতাব্দীতে ইউরোপে সূত্রগুলোর ধারণা প্রদান করেন। মধ্যাকর্ষণ শক্তির ধারণা সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেন জাবির ইবনে হাইয়্যান এটা কিভাবে আমরা জানি? অতি সম্প্রতি জার্মানিতে ৪ খন্ডে একটি বই প্রকাশিত হয়েছে, এই বইতে জাবির ইবনে হাইয়্যান -এর বইয়ের ফটোকপি সংযুক্ত করা হয়েছে। ঐ বইয়ের মাধ্যমে সকলেই এই ব্যাপারে জানতে ও দেখতে পারবে। ইউরোপীয়রা ১৪শ শতাব্দীতে জাবির ইবনে হাইয়্যান -এর বইকে অনুধাবন করেছিল।

কিন্তু তারা এটা বুঝতে পেরেছে ১৬ শতাব্দীতে এবং লাভইসির (lavoisi) সূত্রনামে প্রকাশ করে। অন্যটা ১৭শ শতাব্দীতে বুঝতে পেরেছে সেটাকে গেই লুসাক (Gay lussac) এর সূত্র নামে প্রকাশ করেছে এবং ১৯শ শতাব্দীতে যখন মধ্যাকর্ষণ শক্তির ব্যাখ্যা বুঝতে পেরেছে তখন এটাকে নিউটনের সূত্র ও আবিষ্কার বলে প্রকাশ করেছে। জাবির ইবনে হাইয়্যান সর্বপ্রথম বিজ্ঞানাগারের ধারণার প্রবর্তক। তিনি সর্বপ্রথম পরিমাপ (measurement) এবং পরীক্ষা (experiment) এর উদ্ভাবন করেন। তিনি সর্বপ্রথম একটি বিজ্ঞানাগার প্রতিষ্ঠা করেন। ইউরোপিয়ানরা এখনো সেই মানের কোনো বিজ্ঞানাগার প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। অবশ্যই আমরা যখন এখানে আসি তখন আমাদের বুদ্ধি বিবেক থমকে দাঁড়ায়। কিন্তু জাবির বিন হাইয়্যান হিজরি ২য় শতাব্দীর জ্ঞানকে এতো উৎকর্ষতায় উন্নীত করেছিলেন। আজকে জার্মানিতে জাবির ইবনে হাইয়্যানকে নিয়ে ডক্টরেট করা হচ্ছে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, পশ্চিমারা আমাদের বিজ্ঞানীদের লেখা বই গুলোকে নিয়ে তাদের নামকে গোপন করে, তাদের নিজস্ব অমুসলিম বিজ্ঞানীদের নামে চালিয়ে দিচ্ছে। আর আমরাও তাদের রচিত বইগুলোকে অনুবাদ করে তাদের বিজ্ঞানীদের সম্পর্কে জানাচ্ছি এবং সকল আবিষ্কার তাদের বলে ধারণা করছি আর আমাদের মহান বিজ্ঞানীগণ সম্পর্কে অজ্ঞতার পরিচয় দিচ্ছি। মুসলিমগণ সঠিক ইতিহাসের সন্ধান বিশ্ববাসীকে দিয়েছে। ভূগোল-এর আবিষ্কারও করেছে মুসলিমগণ। অতীতে ইতিহাস ছিলো উপন্যাসনির্ভর। ইবনে খালদুন হলেন সর্বপ্রথম ঐতিহাসিক যিনি ইতিহাসকে উপন্যাস ধারা থেকে বের করে নিয়ে আসেন: ইতিহাস কোনো উপন্যাস হতে পারে না। ইতিহাস হলো সকল মানুষ ও সকল

www.pathagar.org

জাতির পতন ও বসবাস করার কাহিনী। এগুলো বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করে এটি যে একটি জ্ঞানের অন্যতম শাখা এবং এই ব্যাপারে সর্বপ্রথম ইতিহাসের পুস্তক রচনাকারী হলেন ইবনে খালদুন এবং তিনি সর্বপ্রথম ভৌগোলিক মানচিত্র আবিষ্কার করেন। এমনকি আমেরিকাও আবিষ্কার সর্বপ্রথম মুসলিমরাই করেছিলেন।

মুসলিমদের প্রস্তুতকৃত মানচিত্রে আমেরিকার অস্তিত্ব দেখানো হয়েছিল। কিন্তু আমরা জানি যে আমেরিকাকে আবিষ্কার করেছেন ক্রিস্টোফার কলম্বাস। কেনই আমরা সব কিছুই এরকম জানি? কারণ হলো আমরা সকল তথ্য উপাত্ত ইউরোপিয়ানদের থেকে আমদানি করি বলেই এই অবস্থা। দেখুন ক্রিস্টোফার কলম্বাস সম্পর্কে নতুন করে অনুদ্ধান কী বলে? ক্রিস্টোফার কলম্বাস ছিলেন একজন ভেনেডিস্ট (venedians) অর্থাৎ তিনি বণিকদের জাহাজের মাধ্যমে মুসলিম দুনিয়ার সাথে সম্পর্ক তৈরি করেন। অনেক মুসলিম তাদের বই পুস্তক ভেনেডিয়ান (venedian) ও জেনোভিজ (Genovese) ভাষায় অনুবাদ করে সেখানে ইম্পোর্ট করেন। ক্রিস্টোফার কলম্বাস মুসলিমদের সেই সকল বই থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেন যে, যদি পশ্চিমের দিকে সোজা যাওয়া যেতে পারে তাহলে যে নতুন মহাদেশের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। এই জন্য সে, এই ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে প্রথম বারের মতো আটলান্টিক-এর বুকে পাড়ি জমান। ক্রিস্টোফার কলম্বাস মাসের পর মাস পশ্চিম দিকে যেতে থাকে কিন্তু কোনো স্থলভূমি খুঁজে পান না। অবশেষে পরিস্থিতি এমন দাঁড়ায় যে জাহাজের অভ্যন্তরের তার সাথীগণ তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বসে।

তারা বলতে থাকে যে আমরা ফিরে যাব। তুমি নিজেও জান না আমাদেরকে এমন একটি জায়গায় নিয়ে যাচ্ছ। এই যাত্রার কোনো ফলাফল পাওয়া যাবে না। তাদের এই ক্ষোভকে দমন করার জন্য ক্রিস্টোফার কলম্বাস এই কথা বলে তাদেরকে নিবৃত্ত করেন যে "দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ো না, এইভাবে বল না। আমি যদি সঠিকভাবে পশ্চিম দিকে যাই তাহলে যে, নতুন ভূমির সন্ধান পাব এই চিন্তা ও তথ্য মুসলিমদের রচিত বই থেকে জানতে পেরেছি। সে ভূমিতে আমরা অবশ্যই পৌঁছতে পারব। কারণ মুসলিমরা কখনো মিথ্যা বলতে পারে না।" এর পর তারা সকলেই ধৈর্য ধারণ করে সেই পথে যেতে থাকে। অবশেষে তারা আমেরিকা মহাদেশের সন্ধান লাভ করে।

ইতিহাস, ভূগোল, পদার্থ, রসায়ন, গণিত, বীজগণিত (আল জেবরা) সহ জ্ঞান বিজ্ঞানর প্রতিটি শাখায় মুসলিমদের অসামান্য অবদান রয়েছে। আর এই জ্ঞানের উৎকর্ষ সাধনের সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন মুসলিমগণ। ইউরোপিয়ানরা এই জ্ঞান কিভাবে মুসলিমদের কাছ থেকে নিয়েছিল? একটু পর এখানে আসব- ইউরোপিয়ানরা মুসলিমদের সাথে ক্রুসেড-এর সময় মুসলিমদের কাছ থেকে জ্ঞানগুলো নিয়ে আসতে তাদের নিজস্ব ভাষায় অনুবাদ করে শিখতে শুরু করে। কিন্তু প্রথম দিকে তারা এই জ্ঞানকে উপলব্ধি করতে পারেনি। ফ্রান্স যখন স্পেন-এর বিভিন্ন শহর দখল করে নেয় তখন তারা সেই সকল শহরের মুসলিম বিজ্ঞানীদের গড়ে তোলা সকল

www.pathagar.org

লাইব্রেরিকে পুড়িয়ে দেয়। শুধুমাত্র কর্ডোভা শহরের কেন্দ্রবিন্দুতে ত্রিশ হাজার বিজ্ঞানের কিতাবকে পুড়িয়ে দেয়। হালাকু খান যখন আক্রমণ করে তখন বাগদাদের সকল লাইব্রেরির বইগুলোকে টাইগ্রিস ও ফোরাত নদীতে নিক্ষেপ করে।

টাইগ্রিস ও ফোরাত এর মতো খরস্রোতা নদীতে এই বইগুলা প্রবাহিত হতে ১ সপ্তাহের মতো সময় লাগে। ফ্রান্স যখন স্পেনে হামলা করে স্পেনকে দখল করে নেয় তখন তারা বিভিন্ন ইসলামিক জ্ঞান-গবেষণা সেন্টারের তাৎপর্য বুঝতে পারেনি এবং পরবর্তীতে যখন তারা এটা বুঝতে পেরেছিল তখন তারা নিজেদের মধ্যে মুসলিমদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছিল। তারা এতটাই মুসলিমদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল যে, ২০০ বছর পূর্বেও প্যারিস এর সরবোন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ মুসলিমদের ন্যায় জুব্বা পরিধান করত, মাথায় টুপি, পাগড়ি পরত এমনকি তারা সর্বান্তকরণে মুসলিম বিজ্ঞানীদের ন্যায় হওয়ার চেষ্টা করত। এটা এজন্য করত যে, "জ্ঞান বিজ্ঞান উৎকর্ষ সাধন করেছে মুসলিমরা তাই আমরাও যদি তাদের মতো বিজ্ঞানী হতে চাই তাহলে আমাদেরকেও সব দিক থেকে তাদের মতো হতে হবে" -একথা তারা বলত।

ইউরোপিয়ানদের যে ইসলামিক জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রতি এতো ঝোঁক ছিলো এটা যে শুধুমাত্র ২ শতাব্দী পূর্বে ছিলো তা নয়, এখনও তাদের মাঝে এটা বিদ্যমান। ইউরোপিয়ানরা যে শুধুমাত্র আমাদের জ্ঞান বিজ্ঞানকে নিয়েছিল তা নয়, তারা আমাদের জীবন চলার পদ্ধতি থেকেও অনেক কিছুই নিয়েছিল। আমি আপনাদেরকে একটি ঘটনা বলতে চাই। একদিন আমি জার্মানির ডুসেলডুর (Dusseldorf) শহরের একটি অর্থনৈতিক যাদুঘর পরিদর্শনে গিয়েছিলাম। এই জাদুঘরের বিভিন্ন বিভাগ রয়েছে। এর নিচতলায় রয়েছে বাথরুম। যুগের সাথে বাথরুমের কিভাবে উন্নতি হয়েছে এটাকে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। এর উপরের তলায় গাড়ির বিবর্তন দেখানো হয়েছে। এর উপর তলায় বিমানের বিবর্তন (evolution) প্রদর্শন করা হয়েছে। কিন্তু বিমানের বিবর্তন প্রদর্শনীর বিশাল একটি ফ্লোরকে ব্যবহার করা হলেও, বাথরুমের বিবর্তনটা খুবই ছোট একটি কক্ষে প্রদর্শন করা হয়েছে। এটা কেন হয়েছে কারণ হলো তাদের ঘরবাড়িতে কোনো বাথরুম ছিলো না কারণ পূর্বে তারা পানি ব্যবহার করত না। (এখনো জার্মান বাথরুমগুলোতে পানির কোনো ব্যবস্থা নেই। কেন তারা পানি ব্যবহার করত না? জাদুঘরের বাথরুম যে রুমে প্রদর্শন করা হয়েছে সেখানের দেয়ালের উপর লেখাতে আমার চোখ আটকে যায়।

জার্মানির একজন বিখ্যাত দার্শনিক গয়েথ (Geothe) একদিক প্রাকৃতিক কার্য সম্পাদন করার সময় দেয়ালে টানানো ক্যালেন্ডারের দিকে তাকিয়ে দেখেন তিনি সর্বশেষ এক বছর পূর্বে পানি ব্যবহার করেছিলেন। আমাকে ক্ষমা করবেন, আজকে আমরা আমাদের বেডরুমের পাশেই বিভিন্ন আলমিরা ব্যবহার করে থাকি। এটা আমরা নিয়েছি ইউরোপিয়ানদের কাছ থেকে। অথচ তারা এটা ব্যবহার করত প্রাকৃতিক কার্য সম্পাদনের জন্য। কেন তারা এমন ছিলো? কারণ তারা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে

www.pathagar.org

জানত না। এমনকি ফ্রান্সের ভার্সাহ রাজপ্রাসাদে কোনো শৌচাগার ছিলো না। যখন কোনো দূত আসত বা অন্যদেশ থেকে কোনো মেহমান আসত তাদেরকে দুপুরের পর প্রাসাদে ঢোকার অনুমতি প্রদান করত এর আগে নয়। আর এটা হলো এক শতাব্দী পূর্বের ঘটনা।

সকালে না ঢুকতে দেওয়ার কারণ হলো রাতের যে প্রাকৃতিক কাজ কর্ম সেরেছে সেটার গন্ধ যেতে দুপুর পর্যন্ত সময় লেগে যেত। মুসলিমগণ শুধুমাত্র ইউরোপিয়ানদেরকে জ্ঞান বিজ্ঞানের শিক্ষাই প্রদান করেনি বরং তারা সকল মানুষকে মানবিক মূল্যবোধও শিক্ষা দিয়েছে। আজকে ইউরোপে যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা এটা মুসলিমদেরই অবদান। এজন্য আজকে মুসলিমদেরকে হীন ও নীচু মনে করা তাদেরকে তৃতীয় শ্রেণীর নাগরিক মনে করার কোনো অধিকার ইউরোপিয়ানদের নেই। কারণ মুসলিমগণ তাদেরকে যা দিয়েছে তা যদি আজ ফেরত চায় তাহলে ইউরোপিয়ানরা উলঙ্গ হয়ে দরিদ্রের মতো পড়ে থাকবে। কেননা তাদের মস্তিষ্কে যে জ্ঞান রয়েছে সেটা দিয়েছে মুসলিমরা, তার পরনে যে পোশাক সেটা শিখিয়েছে মুসলিমরা, তার মধ্যে সকল সভ্যতা ও মানবিকতা সৃষ্টি করেছে মুসলিমরা।

মুসলিমগণ মানবসভ্যতাকে সকল প্রকার আধ্যাত্মিক ও বস্তুগত জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছে। ইউরোপিয়ানরা না বুঝে এই জ্ঞানকে নিয়েছিল। কিন্তু শতাব্দী থেকে শতাব্দীর পর তারা এটাকে বুঝতে শুরু করেছিল। নিজে থেকে কিছু করার উদ্দীপনা পেয়েছিল তাদের অবস্থা আজকে অনেক দূর এসে বোতলের গলায় আটকে পড়ার মতো। এই সরু পথ থেকে বের হওয়ার শক্তি তাদের নাই এমনকি তারা সামনের দিকেও যেতে পারবে না। কারণ হলো যে সকল মূলনীতি সমূহকে আগে পেশ করা হয়েছে এগুলোর জায়গায় নতুন করে সূত্র বা মূলনীতি তৈরি করার যোগ্যতা তাদের নেই। তাহলে কী হবে? এ প্রশ্নের উত্তর আমি আপনাদের এইভাবে দিতে চাই এরকম একটি কথা আছে। মানুষের কাছে সকল মৌলিক জ্ঞানগুলো এসেছিল নবীগণের মাধ্যমে। শুধুমাত্র আধ্যাত্মিক জ্ঞান নয়, ঈমান, আখলাক, দ্বীন ও ইবাদতের পদ্ধতি নবী করীম সা: এর মাধ্যমে আমরা শিখতে পেরেছি। কিন্তু বস্তুগত বা জাগতিক জ্ঞান নবীদের মাধ্যমে এসেছিল কি না আমরা সবাই সেটা জানি না।

উদাহরণস্বরূপ, জাহাজ তৈরি করা সম্পর্কিত মৌলিক চিন্তা বা ধারণা নূহ আ:-এর নৌকার ঘটনার মাধ্যমে আমরা শিখতে পেরেছি। দর্জি হযরত ইদ্রীস আ:-এর মাধ্যমে, চিকিৎসা হযরত ঈসা আ:-এর মাধ্যমে, জাদুবিদ্যা সম্পর্কিত বিজ্ঞান মূসা আ:-এর মাধ্যমে আমাদের কাছে এসেছে। নবীদের মাধ্যমে আগত এই বিষয়গুলোই আজ জ্ঞান বিজ্ঞানের মূল চাবিকাঠি। আমরা আমাদের এখানে যতো বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি এর সকল জ্ঞান কুরআনে কারীমের মাধ্যমে মানবজাতির কাছে এসেছে। এই জন্য আজকে আমরা যে যুগে যে সমাজে বসবাস করছি আমরা যদি শান্তি, কল্যাণ ও বরকত চাই তাহলে কুরআনে প্রদর্শিত বিধান অনুযায়ী চলা ছাড়া অন্য কোনো বিকল্প নেই।

www.pathagar.org

আমরা বলে থাকি যে, আজ আমরা মহাকাশ এর যুগে বসবাস করছি। অথচ কুরআনে মহাকাশ সম্পর্কে অনেক আয়াত রয়েছে। কিন্তু আমরা এটা জানি না।

কুরআন আমাদের সকল কিছু সম্পর্কে পূর্বাভাস দিয়ে রেখেছে কিন্তু আমরা তা জানি না। কুরআন আমাদেরকে সকল কিছুরই নিদর্শন দিয়েছে। কুরআনে মহাকাশ সম্পর্কে অনেক আয়াত রয়েছে, এখানে সেই সকল আয়াতের ব্যাখ্যা করা সময় স্বল্পতার জন্যে সম্ভব নয়। কিন্তু শুধুমাত্র একটি পয়েন্ট আলোচনা করতে চাই। আর সেটা হলো, যেমন আমি পূর্বে বলেছিলাম যে, বিভিন্ন সূত্রের আবিষ্কারক হলো মুসলিমগণ। যখন আমরা এই সূত্রগুলোকে বিশ্লেষণ করি তখন আমরা এখানে তিনটি জিনিস খুঁজে পাই। এই সূত্রগুলোর মূলে কি এটা তারা কেউ জানে না। অর্থাৎ এগুলোকে বুঝতে হবে। আর এগুলো বুঝার জন্য কুরআনের সাহায্য নেওয়া ছাড়া বুঝা সম্ভব নয়। এটা কিভাবে হবে? দেখুন আমার একজন বন্ধুর একটি প্রবন্ধ রয়েছে। সে আমিরিকাতে দশ বছর শিক্ষকতা করেছে। সম্প্রতি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সে আলোচনা করে যে সে প্রাচীন একটি বই খুঁজে পেয়েছে। সেটা হলো বিখ্যাত কবি ইউসুফ হাস হাজিব-এর লেখা একটি কবিতার বই নাম হল (kutadgu Bilig), ইউসুফ হাস হাজিব একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি। আমরা যদি এই ব্যক্তিকে শুধুমাত্র একজন আধ্যাত্মিক কবি হিসাবে বিবেচনা করি তাহলে আমরা ভুল করব। আমার বন্ধুকে তার কিছু কবিতা দৃষ্টি কেড়েছে। দেখুন তিনি কী লিখেছেন "হে এক ও অদ্বিতীয় সৃষ্টিকর্তা, কেউ তোমার সমকক্ষ হতে পারবে না। শুরুতেও তুমি ছিলে। সকল কিছুর ধ্বংসের পরেও তুমি থাকবে। সকল সৃষ্টি তোমার অস্তিত্ব সম্পর্কে ওয়াকিফহাল। তুমি সৃষ্টি করেছ দুটি, যার একটি তোমার সাক্ষী।" যখন আমরা এটা পড়ি তখন মনে করি যে, এটি আল্লাহ তায়ালার গুণগান বর্ণনা করে আত্যাত্মিক একটি কবিতা তিনি লিখেছেন।

দশ বছর যিনি প্রফেসর হিসাবে শিক্ষকতা করেছেন আমার সেই বন্ধুর মাথাকে এটা দারুণভাবে প্রভাবিত করেছে। কেন? অবশ্যই আমরা জানি না। আমার এই বন্ধু সংখ্যা সম্পর্কিত একটি বই লিখেছে। ১, ২, ৩... যে সংখ্যাগুলো আছে এদের সাথে সম্পর্কিত একটি বই সে লিখেছে। এগুলোকে এমনভাবে গণনা করতে হয় যে, একটি আরেকটির অস্তিত্বকে স্বীকার করে। এরপর অন্যগুলা পুনরাবৃত্তি হয়ে পরবর্তীতে সামনে আসে। অবশ্যই এগুলোর নির্দিষ্ট কোনো গন্তব্য নেই। গণিতে কিছু স্বতঃসিদ্ধ (Axiom) নীতি রয়েছে। ইতালিয়ান গণিতবিদ পিয়ানো (Peano) এই স্বতঃসিদ্ধ নীতিগুলোকে নিয়ে ৫ বছর গবেষণা করেছেন এই সংখ্যাগুলোকে ক্রমভাবে সাজানোর জন্য। পিয়ানো (Peano) কে আজকের গণিত বিদগণ গণিতের স্বতঃসিদ্ধ নীতির জনক বলে থাকেন।

কিন্তু আমার বন্ধু গণিত প্রফেসর তার "ইসলামী সভ্যতা" নামক প্রবন্ধে লিখেছেন যে, "এ স্বতঃসিদ্ধ (Axiom) নীতিটি পিয়ানে ৫ বছর ধরে লিখেছেন। আর ইউসুফ হাস হাজিব আল্লাহ তায়ালার সাথে সম্পৃক্ত চার লাইনের একটি কবিতা লিখেছেন। আল্লাহ তায়ালার এই গুণাবলিকে নিয়ে লিখতে অবশ্যই মেধার প্রয়োজন। আর এই যোগ্যতা

www.pathagar.org

পিয়ানোর যে যোগ্যতা বলে গণিতের পাঁচ বছর স্বতঃসিদ্ধ (Axiom) নীতি লিখেছেন তার চেয়ে হাজিব চার লাইনে এই স্বতঃসিদ্ধ নীতির ইংগিত দিয়েছেন। এটা দ্বারা কি প্রমাণ হয় না যে হাজিবের যোগ্যতা অনেক গুণে বেশি? আমি আমার বইকে বিশ্লেষণ করতে বাধ্য। ইউসুব হাস হাজিব-এর প্রখর মেধার পাশাপাশি পিয়ানোর মতামতকেও প্রাধান্য দিতে বাধ্য। একই সাথে আমি এটাকে শুধু মাত্র পিয়ানোর প্রণীত স্বতঃসিদ্ধ নীতি বলে মেনে নিতে পারি না। আমি এই নীতিকে হাস-পিয়ানোর স্বতঃসিদ্ধ (Axiom) নীতি বলে স্বীকার করি। কারণ এই নীতি বা এর ধারণা পিয়ানোর থেকে হাজিব ৪ শতাব্দী পূর্বে দিয়েছেন।"

এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা চেষ্টা করেছি যে, পাশ্চাত্যের জ্ঞান বিজ্ঞান কোথায় এসে পৌঁছেছে। এখানে আমি এগুলো একত্রিত করে সারাংশ পেশ করতে চাই। প্রথমে আমি আপনাদেরকে একটি প্রশ্ন করতে চাই : মানবজাতির ইতিহাসে জ্ঞান যখন আস্তে আস্তে সামনের দিকে এগুচ্ছিল, কোন কারণে ইসলামী শাসনকালে জ্ঞান বিজ্ঞানে এতো দ্রুত উৎকর্ষতা সাধন করল? কোন জাদুর কাঠি জ্ঞান বিজ্ঞানের উৎকর্ষতায় এতো প্রাণশক্তি প্রদান করল? এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা এ কথা বলতে বাধ্য যে মহাগ্রন্থ আল কুরআনই হলো সে জাদুর কাঠি যেটা জ্ঞান বিজ্ঞানকে উৎকর্ষতার সর্বোচ্চ চূড়ায় পৌঁছে দিয়েছে।

দুনিয়ায় জ্ঞান বিজ্ঞানের এই উন্নতি মানবজাতির সভ্যতার এই উন্মেষ এবং মানুষের দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতা দান করতে পারে একমাত্র মহাগ্রন্থ আল কুরআন। আজকে পাশ্চাত্য জ্ঞানের ক্ষেত্রে যে একটি প্রান্ত সীমায় এসে পৌঁছেছে এটা থেকে প্রশস্ত পথের সন্ধান দিতে পারে একমাত্র এবং কেবলমাত্র মহাগ্রন্থ আল কুরআন। অপর পক্ষে কুরআনের জ্ঞান ব্যতীত একজন ব্যক্তি কখনোই একজন বিজ্ঞানী হতে পারবে না। আমরা অনেক সময় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে তুলনা করে থাকি। একজন খুবই প্রিয় ইসলামিক চিন্তাবিদ সুন্দরভাবে এর সমন্বয় করেছেন। তিনি একবার দীর্ঘ সময় ধরে বক্তৃতা করেন। তিনি তার বক্তৃতায় পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের উপসংহার টানার পর একটি প্রশ্ন করেন। তিনি প্রশ্ন রাখেন যে, "পাশ্চাত্যের দর্শনসমূহ আপনাদেরকে বুঝালাম। আপনারা দেখতে পেলেন যে, তাদের দর্শন হলো একে অপরকে প্রত্যাখ্যান করার দর্শন ডেসকারটেস (Descartes) আসল সে তার পূর্বের দর্শনিকের সকল কিছুকে ভুল বলে নিজের দর্শনকে তুলে ধরল।

তারপর আরেকজন এসে বলে না এভাবে না এভাবে। ডেসকারটেস (Descartes) এভাবে বলেছে এটা এভাবে না এভাবে হবে। এভাবে পাশ্চাত্যের দর্শন -এর সিলসিলা হলো একজনের মতামতকে ভুল ধরে সেটাকে অস্বীকার করে প্রত্যাখ্যান করে অন্যজন সামনে এসেছে। এটাই হলো পাশ্চাত্যের দর্শনের ইতিহাস। কিন্তু প্রাচ্যের মুসলিম ইমামগণ, দার্শনিকগণ তাদের চিন্তাধারাকে প্রকাশ করেছে ক্রমধারাভাবে ধারাবাহিকভাবে। বড় বড় ইমামগণ তাদের কথাকে নবী করীম সা.-এর কথার মাধ্যমে শুরু করেছেন সাহাবীদের থেকে কেউ যখন উদ্ধৃতি দেয় তখন বলে যে অমুক

www.pathagar.org

রাবী এটাকে বর্ণনা করেছেন। বড় বড় মনীষীগণ একজন আরেকজনকে শ্রদ্ধা করে তার সাথে সম্পৃক্ত করে তাদের মতামতকে প্রকাশ করেন। আর ইউরোপিয়ানরা একজন অপরজনকে অস্বীকার করে কথা বলে থাকে। এখন আপনারাই বলুন সত্য কোথায় লুকায়িত? যেখানে সবাই পূর্বের বর্ণনা ও তথ্যকে অবলম্বন করে কথা বলে তার মাঝে না যারা একজন আরেকজনকে প্রত্যাখ্যান করে তাদের মতামতকে পেশ করে? সত্যকে কি কখনো ভুল প্রমাণ করা যায়?

কিন্তু ইউরোপিয়ানদের কাজই হলো সকল শক্তি দিয়ে অপর জনের মতামতকে প্রত্যাখ্যান করা। তাহলে আমরা বলতে পারি সত্য যদি থাকে আর সত্য অবশ্যই আছে, আর সে সত্য হলো মুসলিমদের চিন্তা চেতনায় ও মুসলিম দর্শনে।"

যখন আমরা উপরে দেখে জ্ঞানের জগতে দৃষ্টিপাত করি, প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের মধ্যে পার্থক্য হলো : পাশ্চাত্যের মানুষেরা সত্যিকারের পথ নির্দেশন সম্পর্কে জানে না। এজন্য তারা সত্যকে অনুসন্ধান করে এবং বিশ্লেষণ করে দেখে যে, এটা না। অতঃপর অন্যটা হাতে নেয়, সেখানেও সত্য পায় না, সেটাকেও প্রত্যাখ্যান করে। পাশ্চাত্যের মনীষীদের অবস্থা হলো এমন। কিন্তু প্রাচ্যের মনীষীদের অবস্থা তাদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। সে যখন জ্ঞানের রাজ্যে প্রবেশ করে তখন সে ইসলাম নামক চাবিকাঠি নিয়ে প্রবেশ করে। কুরআনে প্রদত্ত জ্ঞানের মাধ্যমে সে চতুর্দিক আলোকিত করে। কুরআনকে ভিত্তি করে জীবন পরিচালনা করে, নিজে শিখে ও অপরকে শিক্ষা দেয়।

এই পদ্ধতিতে জ্ঞান ও বিজ্ঞান মুসলিমদের কাছ থেকে এসেছে। আর এটাই হলো মুসলিমদের পদ্ধতি। আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে কেউ এ কথা বলতে পারবে না যে, পাশ্চাত্যে এটা আছে ওটা আছে। আমাদের জন্য ও পাশ্চাত্যের জন্য বের হওয়ার রাস্তা হলো একটাই আর সেটা হলো ইসলাম। এ কথাটি শুধুমাত্র আমাদের ঈমানের কারণেই বলতে পারি। আমি আমার জীবনের বড় অংশ জাগতিক জ্ঞানের গবেষণায় কাটিয়েছি। আমি এ কথা দ্বিধাহীন চিত্তে বলতে পারি জাগতিক জ্ঞান-বিজ্ঞান একটি সরুপথে আটকে যায়। আর এই সরুপথ থেকে প্রশস্ত পথের সন্ধান দিতে পারে কেবলমাত্র মহাগ্রন্থ আল কুরআন।

আমি আমার বক্তব্য এই আয়াত দিয়ে শেষ করতে চাই -

رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا • رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ •

১৯৬৯ সালে একটি শিক্ষা সম্মেলনে প্রফেসর ড. নাজিমুদ্দীন এরাবাকানের বক্তব্য

www.pathagar.org

www.pathagar.org

সৃজনশীল বই প্রকাশক ও বিক্রেতা
প্রত্যয় প্রকাশনী
৪৯১ ডি/২, এলিফেন্ট রোড, ওয়ারলেস রেলগেইট, বড় মগবাজার, ঢাকা- ১২১৭
মোবাইল: ০১৬৮৪৫১১৬৬৮, ০১৯৬৬০৫১৮৫৪